কাজী আনোয়ার হোসেনের
কুয়াশা সিরিজ-৭৭

কিলার

শেখ আবদুল হাকিম

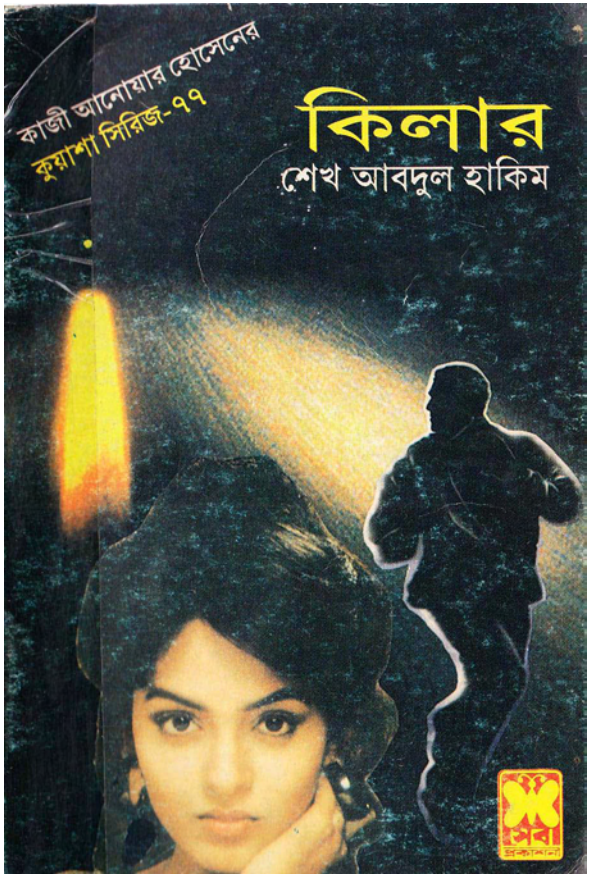

সেবা প্রকাশনী

এক

বীমা ব্যবসায় হায়দার আলির মাথাটা বেশ ভালই খেলে। চার বছর হলো 'উদ্ধার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি'তে যোগ দিয়েছে, বেতন খুব বেশি না হলেও বছরে পাঁচ-ছয় লাখ টাকা কমিশন পায়। সুদর্শন, পৌরুষদীপ্ত চেহারা; ক্লায়েন্ট ধরার জন্যে নিত্য-নতুন কৌশল আবিষ্কারে তার জুড়ি মেলা ভার। কোম্পানির মালিক নেসার আহমেদ খবর রাখেন, তাই মাঝে মধ্যে নিজের চেম্বারে ডেকে পাঠান তাকে, ব্যবসা বাড়ানোর উপায় সম্পর্কে পরামর্শ চান।

তো এই রকম এক সাক্ষাৎকারেই সৃজনশীল আইডিয়াটা হায়দার আলির মাথা থেকে বেরিয়ে আসে। দেশের সব বীমা কোম্পানিই বাণিজ্যিক এলাকা বা মেইন রোডে অফিস খোলে, তাদের প্রতিনিধিরা ক্লায়েন্ট ধরার জন্যে ওই বাণিজ্যিক বা অভিজাত এলাকায় ঘুর ঘুর করে, টার্গেট থাকে নাম করা লোকজন ও ধনী ব্যবসায়ী। হায়দার আলির আইডিয়াটা হলো, পাড়া ও মহল্লায় অফিস খুলতে হবে, বীমা গ্রহণের সুবিধে পৌঁছে দিতে হবে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায়। মানুষ যদি ঘর থেকে বেরিয়েই বীমা কোম্পানির অফিস দেখতে পায়, তাদের মনে সচেতনতা ও আগ্রহ সৃষ্টি হতে বাধ্য।

নেসার আহমেদ ডজন খানেক সফল ব্যবসার মালিক। ভাল

একটা বুদ্ধি শোনা মাত্র বুঝতে পারেন সেটা সোনা প্রসব করবে কিনা। মনে মনে হায়দার আলির আইডিয়াটা লুফে নিলেন তিনি, তবে চেহারাটা নির্লিপ্ত করে রাখলেন। মুখে বললেন, 'এক্সপেরিমেন্ট করে দেখা যেতে পারে। মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে রাখুন, কোন পাড়ায় বা মহল্লায় আমরা যদি শাখা খুলি, আপনাকেই সেখানে ম্যানেজার করে পাঠানো হবে।'

এক হপ্তা পর আবার নেসার আহমেদের চেম্বারে ডাক পড়ল হায়দার আলির। তিনি জানালেন, মীরপুরের পাইকপাড়ায় তিন কামরার একটা অফিস বিল্ডিং ভাড়া করা হয়েছে। একজন দারোয়ান, একজন পিয়ন আর একজন সহকারিণীকে নিয়ে কাল থেকেই ওই অফিসে কাজ শুরু করতে হবে হায়দার আলিকে। হায়দার আলি জানতে চাইল, সহকারিণী কি হেড অফিসের কেউ? মাথা নেড়ে নেসার আহমেদ বললেন, 'না। তসলিমা; আমার মেয়ে। ও খুব ছটফটে, একটু দেখেশুনে রাখবেন। আমি চাই, ব্যবসাটা গোড়া থেকে, হাতে-কলমে শিখুক ও। লক্ষ রাখবেন, কাজে যেন ফাঁকি না দেয়। দিলে সঙ্গে সঙ্গে রিপোর্ট করবেন আমাকে।'

মনে মনে একটু শঙ্কিত বোধ করল হায়দার। নেসার আহমেদের মেয়ে তসলিমাকে কখনও দেখেনি সে, তবে শুনেছে খুবই খেয়ালী আর মেজাজী টাইপের মেয়ে। বি.এ.পাস করার পর গুলশানের প্রাসাদ তুল্য বাড়ি ছেড়ে নিজেদের অন্য একটা বাড়িতে একাই থাকে, বাপ যা বলে ঠিক তার উল্টোটা করাই নাকি তার স্বভাবে পরিণত হয়েছে। তাকে নিয়ে হেড অফিসে নানা রকম আজেবাজে কথা শোনা যায়। কেউ বলে মেয়েটা অবাধ্য, আবার কেউ বলে সৎ মায়ের শয়তানিই তাকে বাড়ি ছাড়া করেছে।

হায়দার আরও শুনেছে, তসলিমা প্যান্ট-শার্ট পরে মোটরসাইকেল চালায়, একটু-আধটু নেশাও নাকি করে। হায়দার আলি নিজেকে আগেভাগেই সাবধান করে রাখল, মালিকের মেয়ে তসলিমার ব্যক্তিগত কোন ব্যাপারে সে জড়াবে না।

হাটখোলার একটা ফ্ল্যাটবাড়িতে ভাড়া থাকে হায়দার, স্ত্রী শাহানা ডাক্তার, একটা ক্লিনিকে চাকরি করে। নতুন শাখা অফিসে স্বামীকে ম্যানেজার করা হয়েছে, রাতে খাবার টেবিলে বসে খবরটা শুনে খুশি হলো সে। বলল, 'পাইকপাড়া অনেক দূরের পথ, গাড়িটা তাহলে কাল থেকে তুমিই নিয়ে যাবে, আমি রিকশায় আসা-যাওয়া করব।' কিন্তু তারপর যখন শুনল হায়দারের সহকারিণী হিসেবে নেসার আহমেদের মেয়ে তসলিমা কাজ করবে, মেয়েলি কৌতূহলবশত একের পর এক প্রশ্ন করল সে। তসলিমা কেমন দেখতে? বয়েস কত? বিয়ে হয়েছে কিনা? স্বভাবচরিত্র কেমন? হায়দার এক কথায় জবাব দিল, তসলিমা সম্পর্কে সে এখনও কিছু জানে না। স্বামীর ওপর অগাধ আস্থা শাহানার, জানে অন্য কোন মেয়ের দিকে সে ফিরেও তাকায় না, কাজেই আপাতত এ-প্রসঙ্গের এখানেই ইতি ঘটল।

পরদিন সকাল আটটায় নতুন শাখা অফিসে পৌঁছুল হায়দার। দারোয়ানের কাছ থেকে চাবি নিয়ে ভেতরে ঢুকে দেখে সামনের দুটো ঘরের মাঝখানে কাচের দেয়াল, পর্দা, কাঠের প্যানেল ইত্যাদি নতুনই লাগানো হয়েছে, কিন্তু চেয়ার-টেবিল, টাইপরাইটার, ফ্যান, সোফা, টেলিফোন সেট আর ফ্যানগুলো সবই পুরানো। নেসার আহমেদ হিসাবী মানুষ, নতুন শাখা অফিস কেমন ব্যবসা করবে না জেনে খরচ যতটা সম্ভব কম করতে চেয়েছেন—হেড অফিসের পুরানো জিনিস দিয়ে সাজিয়েছেন শাখা

অফিসটাকে।

প্রথম কামরাটা ওয়েটিং রুম, সোফা আর কয়েকটা চেয়ার আছে। দ্বিতীয় কামরায় দুটো টেবিল–একটা হায়দারের জন্যে, একটা তসলিমার জন্যে। শেষ কামরাটা ফাইল-পত্র রাখার জন্যে ব্যবহার করা হবে, লোকচক্ষুর অন্তরালে দুপুরের খাওয়ার কাজটাও ওখানে সেরে নেয়া যেতে পারে।

নিজের টেবিলে বসে তসলিমার অপেক্ষায় রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে হায়দার। ঠিক ন'টার সময় অফিসের সামনে একটা রিকশা এসে থামল। পাঁচ ফুট চার কি পাঁচ ইঞ্চি লম্বা এক তরুণ নামল, মাথায় মেয়েদের মত লম্বা চুল, ক্যাপের বাইরে ফুলে ফেঁপে আছে, পরনে টাইট জিনস, এখানে সেখানে সিকি ইঞ্চি করে ছেঁড়া, পায়ে কেডস, গায়ে চটকদার ম্যাগাজিন শার্ট, এক হাতে তামার মোটা বালা। কাচের দেয়াল ভেদ করে হায়দারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি লক্ষ করছে তরুণকে। বয়েস আন্দাজ করা কঠিন, বিশ হতে পারে, আবার পঁচিশ হওয়াও বিচিত্র নয়। এ ছেলে বীমা করতে আসেনি। চাকরি চায় নাকি? উঁহুঁ, নাহ্! হায়দারের জানামতে এ-ধরনের ছেলেরা খেটে খেতে একদমই পছন্দ করে না। সুইংডোর ঠেলে ওয়েটিং রুমে ঢুকল তরুণ, আচরণে শান্ত সপ্রতিভ একটা ভাব, কোন রকম জড়তা নেই। ভুলটা হঠাৎ করেই ভাঙল হায়দারের। ছেলে নয়, মেয়ে! কাচের দরজা ঠেলে সরাসরি দ্বিতীয় কামরায় ঢুকছে, তাকিয়ে আছে তারই দিকে।

'আপনিই তাহলে হায়দার আলি?' জিজ্ঞেস করল মেয়েটা। 'আমার বস্?' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে কামরার চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। 'আমি তমা–তসলিমার সংক্ষেপ আর কি।' গলার কাছে শার্টের একটা বোতাম খুলল। 'রাতে শীত পড়ে, দিনে ভ্যাপসা

গরম, ওয়েদারের কোন বাপ-মা নেই।' সিলিঙের দিকে তাকিয়ে ভুরু কোঁচকাল। 'ফ্যান? শুধু ফ্যান? এয়ারকন্ডিশনার নেই কেন?'

ইতিমধ্যে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে হায়দার। 'না, মানে, নতুন অফিস তো, তাই আপনার আব্বা...'

'শুনুন, আব্বাদের সম্পর্কে আমাকে কিছু বলতে হবে না,' চোখ রাঙিয়ে বলল তসলিমা। 'ওঁদের কাণ্ডজ্ঞান বলে কিছু নেই। এই দেখুন না, কেমন আউটডেটেড নাম রেখেছে আমার–তসলিমা! আমি সেটাকে ভেঙেচুরে তমা বানিয়ে নিজের সম্মান কিছুটা হলেও রক্ষা করতে পেরেছি। আপনার নামটাও তো বিচ্ছিরি! হায়দার আলি! এখানে আমাকে সহকারিণী হিসেবে পেতে হলে আপনাকেও নামটা বদলাতে হবে। হায়দারের হায়...নাহ্!' বলেই খিলখিল করে হেসে উঠল। 'দার? নাহ্, এতেও ছন্দ নেই, কোন অর্থও বহন করে না। আলি-র আ নিন, হায়দারের দার নিন, কি হলো–দারা। কি, পছন্দ হয়?' কথা বলতে বলতে হায়দারের টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল, ছোঁ দিয়ে তুলে নিল টেলিফোনের রিসিভার। ডায়াল করল দ্রুত।

হায়দার হাঁ করে তাকিয়ে আছে এখনও।

'কে, বাপ্পি? আমার একটা প্রশ্ন আছে। তুমি কি চাও সারাদিন এই অফিসে বসে ঘামে সেদ্ধ হই আমি? দু'ঘণ্টা সময় দিলাম, একজোড়া এয়ারকন্ডিশনার পাঠিয়ে দাও। নতুন, নতুন! তা না হলে আমার পক্ষে তোমার এই অফিসে বসা সম্ভব নয়।' খটাস করে রিসিভার নামিয়ে রাখল তসলিমা।

হায়দারের মুখের হাঁ আরও বড় হয়ে গেছে। নেসার আহমেদের সঙ্গে এই ভাষায় কেউ কথা বলতে পারে, এটা সে কল্পনাও করতে পারে না।

নিজের টেবিলে বসে মুচকি একটু হাসল তসলিমা। হাসিটা ধীরে ধীরে নিভে গেল টেবিলের ওপর রাখা টাইপরাইটারের ওপর চোখ পড়তে। হাত বাড়িয়ে টেলিফোন সেটটা নিজের টেবিলে টেনে নিল, ডায়াল করল আবার হেড অফিসে। 'বাপ্পি? তুমি কি ভেবেছ মান্ধাতা আমলের এই টাইপরাইটারে কাজ করব আমি? বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে তোমার বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে গেছে জানি, কিন্তু তাই বলে এতটা! এখুনি একজোড়া আইবিএম পিসি পাঠিয়ে দাও, প্রিন্টারসহ, তা না হলে মেয়েকে কাজ শেখাবার ইচ্ছা ত্যাগ করতে হবে তোমাকে।' এবারও উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে যোগাযোগ কেটে দিল। হায়দারকে বলল, 'দেখুন না, কম্পিউটর আর এয়ারকন্ডিশনার কেমন ভোজবাজির মত পৌঁছে যায়!'

দীর্ঘ সময় নিয়ে শ্বাস টানল হায়দার। 'মি. নেসার আহমেদ আপনাকে নিশ্চয়ই খুব ভালবাসেন...'

আবার খিলখিল করে হেসে উঠল তসলিমা। 'সেই যখন হাঁটতে শিখেছি তখন থেকে বাপ্পিকে আমি নাচাই।' পরক্ষণে ম্লান হয়ে গেল চেহারাটা। 'শুধু এক জায়গায় হেরে গেছি আমি।' হায়দারের দিকে আবার তাকাল, ভুরু কুঁচকে বলল, 'আমাকে আপনি আপনি করবেন না। তুমি বলবেন। আর নাম ধরবেন।'

হায়দার হঠাৎ আড়ষ্টবোধ করল, কারণ তসলিমা তাকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছে, ঠোঁটের কোণে দুষ্ট হাসির রেখা ফুটে আছে। 'দারা, আপনি এই পোশাক পরে মানুষকে বীমা সম্পর্কে আগ্রহী করতে চান? ভুল, ভুল! পোশাক-পরিচ্ছদে আপনাকে আরও স্মার্ট হতে হবে, আরও আধুনিক হতে হবে।'

নিজের কাপড়চোপড়ের দিকে তাকাল হায়দার। চারকোল কালারের একটা স্যুট পরে আছে সে, সঙ্গে কনজারভেটিভ টাই

আর সাদা শার্ট, পায়ে পালিশ করা শূ। 'কেন, ভুল বলছেন...বলছ কেন?'

'মহল্লার সাধারণ মানুষকে বীমা গ্রহণে উৎসাহী করতে হবে, এটাই তো বাপ্পির নতুন আইডিয়া, তাই না?' জিজ্ঞেস করল তসলিমা। হায়দার কোন প্রতিবাদ করল না। 'সাধারণ মানুষ, মানে যারা খুব কম আয় করে, আপনার এই স্যুট আর টাই দেখে তারা এত ভয় পাবে যে দরজাই খুলবে না। আপনাকে মাস্তান সাজতে হবে, দারা। সাধারণ মানুষ রঙবাজদের যে কি খাতির করে, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করবেন না। হয়তো ভয়েই করে, তবে করে!' হায়দারের দিকে তর্জনী তাক করল। 'কাল থেকে আপনি জিনস পরে আসবেন। চুলও আরও লম্বা করতে হবে। খুব ভাল হয় শার্টের ওপর যদি চোখে পড়ার মত একটা জ্যাকেট পরেন।'

একটা ঢোক গিলে মাথা ঝাঁকাল হায়দার। যুক্তিটা সে মানতে পারছে না, তবে মালিকের মেয়ের সঙ্গে তর্ক করারও সাহস পাচ্ছে না। 'তুমি অফিসে থাকো, আমি পাড়াটা একবার চক্কর দিয়ে আসি,' বলল সে। 'দেখি, কোন ক্লায়েন্ট ধরতে পারি কিনা।' সত্যি কথা বলতে কি, তসলিমার কাছ থেকে পালিয়ে এল সে।

বাড়ির উঠানে একা একা খেলছিল মেয়েটি, ফ্রকটা তেমন পরিষ্কার না হলেও ঝুঁকে তাকে কোলে তুলে নিল হায়দার, জিজ্ঞেস করল, 'তোমার নাম কি, মা? তোমার আব্বু কি করেন?'

এলো চুল, হাতে একটা খুন্তি, শাড়ির আঁচল ধুলোয় লুটাচ্ছে, ছুটে এসে হায়দারের কোল থেকে মেয়েকে ছিনিয়ে নিল মা। 'কেডা আপনে? আমার মাইয়ারে কোলে নিলেন ক্যান? কি চান?' তুবড়ি ছুটছে মুখে।

হায়দার একটুও অপ্রস্তুত হলো না। হাসিমুখে বলল, 'আপনাদের পাড়ায় আমরা বীমা অফিস খুলেছি। আপনার এই মেয়ে যখন কলেজে ভর্তি হবে, তার লেখাপড়ার খরচ আমরাই আপনাকে দেব। আপনারা শুধু দৈনিক দশটা করে টাকা অফিসে জমা দেবেন–মাসে তিনশো টাকা মাত্র। আবার, আপনার স্বামীর জীবন বীমাও করতে পারেন, মাসে বিশ টাকা করে দিলেই চলবে...'

'না-না, কাইটা পড়েন,' মুখ ঝামটা দিয়ে বলল মেয়ের মা। 'আমি মাইয়া মানুষ, আপনে পরপুরুষ, আমার লগে আপনার আবার কতা কি! হে যহন থাকব তহন আইসেন, এহন যান।'

'ঠিক আছে, পরে আসব,' বলে হাসিমুখেই বিদায় নিল হায়দার। একটা গলি পার হয়ে অন্য একটা এলাকায় ঢুকল সে। পাশাপাশি অনেক বাড়ি, সাধারণ গরীব মানুষদের বসবাস। একে একে সব বাড়িতেই গেল সে। প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রায় একই রকম অভিজ্ঞতা হলো তার। বীমা সম্পর্কে কারও তেমন আগ্রহ নেই। শুধু তাই নয়, তাকে দেখামাত্র দূরে সরে যাচ্ছে গৃহবধূরা। হায়দারের সন্দেহ হলো, তাহলে কি তসলিমার কথাই সত্যি? তার এই স্যুট-বুট দেখে ভয় পাচ্ছে সবাই? বাজারের পাশ দিয়ে অফিসে ফেরার সময় পুরানো কাপড়চোপড়ের একটা দোকান দেখতে পেল সে। জিনসের প্যান্ট থেকে শুরু করে গার্মেন্টস-এর বাতিল শার্ট, এমন কি পুরানো কেডসও পাওয়া যায়। দোকানে ঢুকে একটা জিনসের প্যান্ট, একটা টি-শার্ট আর একজোড়া কেডস কিনল, দাম পড়ল সব মিলিয়ে মাত্র তিনশো টাকা। দোকানি জানাল, শার্টটা নতুনই, আর প্যান্টটা তারা ধুয়ে ইস্ত্রি করে রেখেছে। দোকানের পিছনের একটা কামরায় ঢুকে কাপড়চোপড় পাল্টাল সে, স্যুট-টাই-বুট একটা পলিথিনের ব্যাগে ভরে বেরিয়ে

এল দোকান থেকে। অফিসের দিকে গেল না, একটা গলি ধরে নতুন আরেক পাড়ায় ঢুকল।

এবার সম্পূর্ণ অন্যরকম ফল পেল হায়দার। এক গৃহবধূর সঙ্গে কথা বলছে, বোঝাচ্ছে বীমা করলে কি কি লাভ, তার কথা শোনার জন্যে চারপাশে আরও অনেক মহিলা ভিড় করল। বেশ আগ্রহের সঙ্গে তার বক্তব্য শুনল সবাই। অনেকেই কাগজ-পত্র চাইল, স্বামী বাড়ি ফিরলে দেখাবে। ওই একই বাড়ির উঠানে দাঁড়িয়ে তিনজন ক্লায়েন্ট যোগাড় করে ফেলল হায়দার। আরও তিনজন কথা দিল কাল তারা অফিসে যে যার স্বামীকে পাঠাবে। হায়দার তাদেরকে বলল, শুধু নিজেরা যাবেন না, আত্মীয় ও প্রতিবেশীদেরও নিয়ে যাবেন–সবাইকে জানাবেন, পাড়ায় আমরা অফিস খুলেছি বিপদের সময় মানুষকে সাহায্য করার জন্যে।

ফেরার পথে আরও তিনজন ক্লায়েন্ট পেল হায়দার। সব মিলিয়ে এগারোজন কথা দিয়েছে, দু'চারদিনের মধ্যে অফিসে এসে বিস্তারিত জানবে তারা।

অফিসে ফিরতে আড়াইটা বেজে গেল। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে, তবে প্রথম দিনই ক্লায়েন্ট পাওয়ার আনন্দে সেটা ভুলে থাকতে কোন অসুবিধে হচ্ছে না।

আইবিএম কম্পিউটরে কি যেন টাইপ করছে তসলিমা। কয়েকজন লোককে সামনের দুটো কামরায় এয়ারকন্ডিশনার ফিট করতে ব্যস্ত থাকতে দেখা গেল। কম্পিউটর থেকে মুখ তুলে হায়দারকে দেখল তসলিমা, তারপর প্রায় চেঁচিয়ে উঠে বলল, 'ও মাই গড! আপনাকে তো চেনাই যাচ্ছে না! এ-সব আপনি পেলেন কোথায়?'

'বাজারের একটা দোকান থেকে কিনলাম,' বলল হায়দার,

তারপর স্বীকার করল, 'আপনার কথা কিছুটা হলেও সত্যি, স্যুট-টাই পরা লোক দেখলে ওরা কথা বলতে চায় না। বিশ্বাস হয়, মাত্র এক বেলাতেই ছয়জন ক্লায়েন্ট পেয়ে গেছি? আরও এগারোজন কাল-পরশু আসবে বলেছে।'

'আপনি নয়, তুমি,' স্মরণ করিয়ে দিল তসলিমা। 'ছ'টা, সত্যি বলছেন? উফ, বাপ্পি যা খুশি হবে না! শুনুন, আমিও আপনার চেয়ে খারাপ করিনি। আমাকে কোথাও যেতে হয়নি, দরজা খুলে স্রেফ ঢুকে পড়ল ওরা। কয়েকজনই ঢুকেছিল, দু'জনকে গিলিয়েছি!'

ঢুকবে না! ভাবছে হায়দার। ভরাট স্বাস্থ্যের ওপর যেরকম টাইট জিনস পরে আছ, তোমাকে দেখতে গোটা পাড়ার লোক ভিড় করলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। মসজিদের ইমাম সাহেব মুসল্লীদের নিয়ে মিছিল করে এলেও আমি আশ্চর্য হব না! মুখে বলল, 'তুমি খেয়েছ? আমার কিন্তু প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে।'

'আসুন আমার সঙ্গে,' বলে চেয়ার ছাড়ল তসলিমা। তার পিছু নেয়ার সময় হায়দার লক্ষ করল, অফিসের লোকজন তসলিমার দিকে আপত্তিকর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ওদের আর কি দোষ, মেয়েটার দিকে তাকালে সে-ও তো চোখ ফেরাতে পারছে না, তাই চেষ্টা করছে না তাকাতে।

ভেতরের ঘরে ঢুকে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল তসলিমা, ফলে তার গায়ের ওপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়তে যাচ্ছিল হায়দার। কোন রকমে তাল সামলে জানতে চাইল, 'কি ব্যাপার?'

'ব্যাপার আবার কি, এখন আমরা খেতে বসব,' বলে হায়দারের একটা হাত ধরে ডিভানে বসল তসলিমা। হায়দার দেখল নিচু টেবিলের ওপর একজোড়া জুস ক্যান, দুটো কোক,

দু'গ্লাস পানি আর টিস্যু পেপারে মোড়া বিশাল আকৃতির দুটো বার্গার রয়েছে। 'প্রথমদিনই বেশি চাপ দেয়া ঠিক না, তবে কথা দিচ্ছি এক হপ্তার মধ্যে বাপ্পিকে বাধ্য করব একটা রেফ্রিজারেটর পাঠিয়ে দিতে। নিন, শুরু করুন।'

'শুরু করার আগে জানতে হবে কে খাওয়াচ্ছে,' বলল হায়দার। 'কোম্পানির পয়সায় লাঞ্চ করার নিয়ম নেই।'

'এখন থেকে তোমাকে আমি তুমি বলব, ঠিক আছে?' বার্গারে কামড় দিয়ে বলল তসলিমা। 'কারণ জিনস আর কেডস পরায় তোমার বয়েস কমে গেছে। কোম্পানির নয়, দারা, আমি খাওয়াচ্ছি। কাল কিন্তু তুমি খাওয়াবে আমাকে, মনে থাকে যেন।'

চারদিন অফিস করার পর হায়দার বুঝতে পারল, তার আইডিয়া সত্যি সত্যি সোনা প্রসব করতে যাচ্ছে। এলাকার প্রায় দুশো পরিবারের সঙ্গে কথা হয়েছে তার, ক্লায়েন্ট পাওয়া গেছে ত্রিশজন, মাস পেরুবার আগেই বাকি সবাইকে রাজি করাতে পারবে বলে বিশ্বাস করে সে। কাল শুক্রবার, ছুটির দিন, তা সত্ত্বেও পাড়ার হাইস্কুল হেডমাস্টারের সঙ্গে আলোচনা করে স্কুলেই অভিভাবকদের একটা সমাবেশের আয়োজন করেছে। ওই সমাবেশে বীমার উপকারিতা সম্পর্কে তাদেরকে বোঝাবে সে। কমিশনের একটা অংশ হেডমাস্টারও পাবেন, কাজেই অভিভাবকদের হাজির করার জন্যে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন বলে আশা করা যায়। খবরটা শুনে খুশি হয়েছে তসলিমা। বলল, সে-ও সমাবেশে থাকতে চায়। মনে মনে প্রমাদ গুণল হায়দার। তসলিমার যে বেশভূষা, অভিভাবকরা তাকে দেখলে স্রেফ খেপে যাবেন। আমাদের এই সমাজ অত্যন্ত রক্ষণশীল, কিন্তু সেটা তসলিমাকে বোঝাতে

যাওয়াটা হায়দারের জন্যে অনধিকার চর্চা হয়ে যায়। নরম সুরে সে তাকে বলল, 'তসলিমা, দু'জনের একজনকে অফিসে থাকতে হবে। ভেবে দেখো না, আমার বক্তব্য শুনে ওরা যদি কালই পলিসি নিতে চান, অফিসে কেউ না থাকলে ওদেরকে সামলাবে কে?' হায়দারের ভাগ্যই বলতে হবে, কথাটা মেনে নিল তসলিমা।

রাতে বাড়ি ফিরে শাহানাকে কথাটা বলতেই মুখ ভার করল সে। 'একটাই মাত্র বোন আমার, কাল ওদের প্রথম বিবাহবার্ষিকী, অথচ সেটাই তুমি ভুলে বসে আছ? এটা কোন কথা হলো, ছুটির দিন অফিস করতে হবে!'

'আরে, এত ঘাবড়াবার কি আছে! অনুষ্ঠান তো রাতে, তাই না? তুমি তৈরি হয়ে থেকো, সন্ধের আগেই ফিরে এসে নিয়ে যাব তোমাকে,' বলল হায়দার।

খেতে বসে আজও একবার তসলিমা সম্পর্কে কৌতূহল প্রকাশ করল শাহানা, 'তোমাকে একটু অন্যমনস্ক লাগছে, নাকি আমার দেখার ভুল? কোম্পানি মালিকের মেয়ে তোমার ওপর চোটপাট করে নাকি?'

'আরে না! একটু খেয়ালী আর ছটফটে, তবে আমার কোন সমস্যা হচ্ছে না।'

'ছুটির দিনও ডিউটি করতে হচ্ছে, আয় তো মনে হয় ভালই হবে, কি বলো?'

'হ্যাঁ, আশা করছি প্রথম মাসে লাখখানেক টাকা কমিশন পাব।'

লাখ টাকার কথা শুনে তসলিমা সম্পর্কে আর কোন প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকল শাহানা।

অভিভাবকদের সমাবেশ সোনা নয়, ঘোড়ার ডিম প্রসব করল।

হলরূমে দু'শো চেয়ার পাতা হয়েছে, লোক এসেছে মাত্র পনেরোজন, তাদের মধ্যে হেডমাস্টার আর তাঁর স্ত্রীও আছেন। তারপরও প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে নিজের বক্তব্য যতটা সম্ভব সহজ ভাষায় বলে গেল হায়দার, মুখে অমায়িক হাসিটা জোর করে ধরে রেখেছে। বক্তব্য শেষ হতে প্রশ্ন আহ্বান করা হলো। প্রতিটি প্রশ্নের বিস্তারিত জবাব দিল সে। তারপর ভৌতিক নিস্তব্ধতা নেমে এল হলরূমে। প্রায় মিনিটখানেক পর একজন ট্রাক ড্রাইভার হাত তুলে জানাল, সে তার দুই বাচ্চার জন্যে শিক্ষাবীমা গ্রহণ করবে। তার দেখাদেখি আরও ছ'জন হাত তুলল। বাকি ছ'জন বলল, চিন্তা করার জন্যে সময় দরকার তাদের।

সবাই বিদায় হতে হেডমাস্টার হায়দারের কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'ভুলটা আমাদেরই হয়েছে, হায়দার সাহেব। আমাদের মনেই ছিল না যে আজ শুক্রবার, জুম্মার দিন। সময় নির্ধারণেও ভুল হয়ে গেছে। বেলা বারোটায় লোক মসজিদে যাবার প্রস্তুতি নেবে, নাকি আপনার কথা শুনতে আসবে?'

হায়দারের ইচ্ছে হলো নিজের গালে কষে চড় মারে।

'তবে নিরাশ হবেন না,' হেডমাস্টার উৎসাহ দিলেন। 'যারা এসেছিল, তারাই লাউডস্পীকারের কাজ করবে, দেখবেন। কাল আপনাদের অফিসে লোকে লাইন দিলে আমি একটুও আশ্চর্য হব না। এলাকার লোকজনকে আমি চিনি, ভাল কাজে তারা পিছিয়ে থাকে না।'

অফিসে ফিরে এসে তসলিমাকে ঘটনাটা বর্ণনা করল হায়দার। সে অনুরোধ করায় মেয়েটা আজ শাড়ি পরে এসেছে। হায়দার নিজেও জিনসের প্যান্ট আর শার্টের ওপর নীল রঙের

হালকা জ্যাকেট পরেছে। জ্যাকেটটা মাত্র দু'হপ্তা আগে কিনেছে সে, বোতামগুলো হৃৎপিণ্ড আকৃতির তামা। শুধু এই বোতামগুলোর জন্যে জ্যাকেটটা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হায়দারের বর্ণনা শুনে তসলিমা হেসে উঠে বলল, 'ফ্লপ বলছ কেন? তেরোজনের মধ্যে সাতজন পলিসি নিতে রাজি হয়েছে, সাকসেস রেট ফিফটি পার্সেন্টের চেয়েও বেশি। আর কি আশা করো তুমি?'

ম্লান একটু হেসে চুপ করে থাকল হায়দার। খানিক পর বলল, 'শুধু শুধু অফিস খুলে রেখে লাভ কি। তুমি চলে যাও, তিনটে পর্যন্ত অপেক্ষা করে আমিও বাড়ি ফিরব।'

হঠাৎ মুখটা শুকিয়ে গেল তসলিমার। 'দারা ভাই, একটা সমস্যা হয়েছে। একা বাড়ি ফিরতে ভয় করছে আমার।'

'সমস্যা? কি সমস্যা?'

'কল্যাণপুরের বাড়িতে আমি একা থাকি, সে তো আপনি জানেনই,' বলল তসলিমা। 'আসা-যাওয়ার পথে কয়েকটা বখাটে ছেলে আমাকে টিজ করত, আমি শুনেও না শোনার ভান করতাম। কিন্তু সাহস বাড়তে বাড়তে এমন বেপরোয়া হয়ে উঠেছে, সেদিন ওরা আমার পথ আটকে দাঁড়িয়ে ছিল। আমি কারাতে জানি, বিপদ টের পেয়ে মারমুখো হয়ে উঠি। ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল বটে, কিন্তু বলে গেল আমাকে ওরা দেখে নেবে। সেই থেকে রোজই ওদেরকে দেখছি, বাড়ির চারপাশে ঘুর ঘুর করে, অশ্লীল মন্তব্য করে।'

হায়দার নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন, তা সত্ত্বেও না বলে পারল না, 'দিনকাল খুব খারাপ, তসলিমা, একা থাকা তোমার উচিত হচ্ছে না। তাছাড়া, আমাদের এটা রক্ষণশীল সমাজ, বাইরে বেরুবার আগে চিন্তা করা দরকার তোমার কাপড়চোপড় দেখে

মানুষ কি ভাববে।'

'তোমাকে মুরুব্বীর ভূমিকায় মানায় না, তবে তুমি যে আমার ওয়েলউইশার আমি জানি,' হেসে উঠে বলল তসলিমা। 'এই দেখো না, তোমার কথামত আজ কেমন বাঙালী লক্ষ্মী সেজে এসেছি।' চেয়ার ছেড়ে এক পাক ঘুরল সে। 'সত্যি কথা বলবে, কেমন লাগছে আমাকে?'

'তুমি যদি এখন থেকে শাড়ি পরে অফিস করো, আমি সত্যি খুব খুশি হব,' শান্ত গলায় বলল হায়দার।

'মোটরসাইকেলটা খারাপ হয়ে গেছে,' মুখের হাসি মুছে বলল তসলিমা। 'তা না হলে তোমাকে আমি পৌঁছে দিতে বলতাম না। রিকশায় গেলে আজও যদি ওরা আমার পথ আটকায়?'

ভয় পেয়ে গেল হায়দার। 'তোমাকে পৌঁছে দিতে হবে?'

'দিলে ভাল হয় আর কি। আমার বাড়িটাও তো তোমার চিনে রাখা দরকার।'

হায়দার তারপরও ইতস্তত করছে দেখে তসলিমা বলল, 'বাপ্পিও কিন্তু বলে দিয়েছে, তুমি যেন আমার বাড়িটা চিনে রাখো।'

অগত্যা বাধ্য হয়েই রাজি হতে হলো হায়দারকে। 'ঠিক আছে, চলো। শুধু বাড়িটা দেখে আসব, ভেতরে ঢুকব না, কেমন?'

'সে দেখা যাবে,' বলে হায়দারের হাত ধরে টান দিল তসলিমা। 'এখন চলো তো।'

বাড়ির সামনে পর্যন্ত গাড়ি গেল না, পথের ওপর ইঁট আর বালির পাহাড় বাধা হয়ে আছে। জায়গাটা একেবারে নির্জন, আশপাশে আর কোন বাড়িঘর নেই, চারদিকে এত বেশি ঝোপ আর

গাছপালা যে রীতিমত জঙ্গলের মত লাগল। আসার পথে বখাটে ছেলেদের কাউকে দেখেনি হায়দার, তবে এ-প্রসঙ্গে তসলিমাকে কোন প্রশ্নও করেনি। সামনে বাধা দেখে গাড়ি থামাতে তসলিমা বলল, 'এই ইঁট আর বালি বাপ্পি কিনে রেখেছে, বাড়িটা ভেঙে পাঁচতলা করবে। এখান থেকে হাঁটতে হবে আমাদের।'

'কতদূর?'

'এই একশো গজের মত। নামো।'

'এইটুকু পথ একা যেতে পারবে না? আমাকে আবার নামতে হবে কেন?'

'তুমি কোথায় এসেছ, বুঝতে পারছ?' পাল্টা প্রশ্ন করল তসলিমা। 'আমাদের বাড়ির কাছেই সেই কুখ্যাত কল্যাণপুর বস্তি, তারপর বিশাল জলা। ছেলেগুলো ওই বস্তি থেকে এসে বাড়ির চারপাশে ঘুরঘুর করে।'

গাড়ি থেকে নেমে তসলিমার পিছু নিল হায়দার। কিছু দূর হাঁটার পর গাছপালার ফাঁকে একতলা বাড়িটা দেখা গেল। 'এবার আমি যাই?' জিজ্ঞেস করল হায়দার।

জবাবে ওর একটা হাত ধরল তসলিমা। 'এত যাই যাই করছ কেন? আমি কি ডাইনী নাকি যে তোমাকে খেয়ে ফেলব?' বলেই খিলখিল করে হেসে উঠল। বারান্দায় উঠে হাতব্যাগ থেকে চাবি বের করল, তালা খুলে ঢুকে পড়ল ভেতরে। 'সত্যি কথাটা তাহলে বলেই ফেলি। বখাটে ছেলে-টেলে মিথ্যে অজুহাত। সত্যি কথা বললে আসতে না, তাই একটু কৌশল করতে হলো। আজ আমি তোমাকে খাওয়াব, নিজের হাতে রান্না করে রেখে গেছি, বুঝলে!' দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে হায়দার, তার হাত ধরে টান দিয়ে ভেতরে ঢোকাল, প্রায় ধাক্কা দিয়ে একপাশে সরিয়ে দিয়ে বন্ধ করে

দিল দরজাটা।

'কাজটা ভাল করোনি,' প্রতিবাদের সুরে বলল হায়দার। 'বাড়িতে আর কেউ নেই? চাকরবাকর?'

'তোমাকে একা পাবার জন্যে ওদেরকে আমি ছুটি দিয়ে দিয়েছি,' হায়দারের কাঁধে একটা হাত রেখে বলল তসলিমা। 'কথা দিচ্ছি, তোমার কোন দুর্নাম হবে না।' কাঁধ থেকে তার হাতটা সরিয়ে দিল হায়দার। 'কেউ জানতেই পারবে না তুমি এখানে এসেছ।'

হায়দার শুকনো মুখে বলল, 'তসলিমা, কাজটা আমরা অন্যায় করছি। এরকম মিথ্যে একটা ছুতোয় আমাকে তোমার এখানে নিয়ে আসা উচিত হয়নি। ভুলে যেয়ো না, আমি বিবাহিত। আমাদের এমন কিছু করা উচিত নয় যা গোপন করার দরকার হয়।'

'বিবাহিত হও বা যাই হও, তোমার সঙ্গ পাবার জন্যে পাগল হয়ে আছি আমি,' বলে হায়দারের গায়ে সেঁটে এল তসলিমা। 'তোমার বউ তোমাকে কখনও বলেছে, তুমি লেডি কিলার? তোমাকে দেখলে যে-কোন মেয়ের মাথা খারাপ হয়ে যাবে? বলেছে কখনও?'

পিছু হটার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো হায়দার, তসলিমা তাকে ছাড়ছে না। হায়দারের ইচ্ছে হলো বলে, আমি কিন্তু চিৎকার করব। সেটা কিরকম হাস্যকর শোনাবে বুঝতে পেরে দিশেহারা বোধ করল সে। তারপর যেন সব কিছু দুঃস্বপ্নের ভেতর ঘটতে শুরু করল। শাহানার চেহারাটা ভেসে উঠল চোখের সামনে, কিন্তু সেটার জায়গায় বারবার তসলিমার মুখ চলে আসছে। ধস্তাধস্তি শুরু করল

সে, কিন্তু উপলব্ধি করল তসলিমার বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার ইচ্ছাটা ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে আসছে। তসলিমা তাকে টানতে টানতে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে–বেডরুমে? শেষ একটা চেষ্টা করে দেখল হায়দার, কিন্তু ধাক্কা খেয়ে বিছানায় পড়ার পর বুঝতে পারল তসলিমার হাত থেকে তার আজ রেহাই নেই।

ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে খচ করে অপরাধবোধের একটা খোঁচা অনুভব করল হায়দার। ঘরের ভেতর অন্ধকার। ধীরে ধীরে সব কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। পাশ ফিরতে দেখল, তার পাশেই শুয়ে রয়েছে তসলিমা। হাতঘড়ি দেখল–সাড়ে সাতটা বাজে। তারমানে প্রায় ছ'ঘণ্টা ঘুমিয়েছে সে। মনে পড়ল, দুপুরে খাওয়া হয়নি।

বিছানা ছেড়ে নামতে যাবে হায়দার, নগ্ন একটা হাত তার গলা জড়িয়ে ধরল। এক ঝটকায় হাতটা সরিয়ে দিল সে। 'ছাড়ো আমাকে, যেতে দাও–শাহানা আমার জন্যে অপেক্ষা করছে!' বিছানা থেকে নেমে দ্রুত কাপড়চোপড় পরছে।

'শাহান তোমার স্ত্রী, তার কাছে তো ফিরতেই হবে তোমাকে,' হেসে উঠে বলল তসলিমা। 'কিন্তু আজ যা ঘটল, এরপর তোমার ওপর আমারও খানিকটা অধিকার জন্মেছে–অস্বীকার করতে পারো?'

'আমরা ভুল করছি, যে ভুলের ক্ষমা নেই,' বিড়বিড় করল হায়দার।

বিছানা ছেড়ে নেমে আলো জ্বালল তসলিমা। 'ভুলে যেয়ো না আমি তোমার বসের মেয়ে। এ-ও ভুলো না যে আমি সহজলভ্য একটা মেয়ে নই। তোমাকে সাঙ্ঘাতিক ভাল লেগে গেছে বলেই–,' সে-ও দ্রুত কাপড় পরছে।

দরজার কাছে পৌঁছে গেল হায়দার। 'এই শেষ, তসলিমা। আর কোন দিন এই ভুল আমরা করব না।'

'সে দেখা যাবে,' বলল তসলিমা। দাঁড়াও, টর্চটা খুঁজে বের করি–বাইরে অন্ধকার।'

বাড়ি থেকে বেরিয়ে হন হন করে হাঁটতে শুরু করল হায়দার। ছুটে তার পাশে চলে এল তসলিমা, হাতের টর্চ সামনে আলো ফেলছে। 'ছি-ছি, তোমার খাওয়া হয়নি,' বলে হায়দারের হাত ধরে টান দিল সে। 'আধ ঘণ্টা দেরি করে ফিরলে কি আর হবে, এসো দু'মুঠো খেয়ে যাও।'

'না!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল হায়দার। 'শাহানা আমার জন্যে তৈরি হয়ে বসে আছে, ওকে নিয়ে ওর বোনের বাড়ি মহাখালি যেতে হবে আমাকে।' নিজেকে ছাড়াল সে, তসলিমার হাত থেকে টর্চটা প্রায় কেড়ে নিয়ে বলল, 'তুমি ফিরে যাও, আমি একাই যেতে পারব।' কাঁধ ঝাঁকিয়ে উল্টোদিকে হাঁটা ধরল তসলিমা।

পঞ্চাশ গজের মত এগিয়েছে হায়দার, গাছপালার ভেতর থেকে ছুটে আসা বাতাসে হঠাৎ পচা একটা কিছুর দুর্গন্ধ পেল। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। নিশ্চয়ই কোন কুকুর বা বিড়াল মরে পড়ে আছে। সরু পায়ে চলা পথের ওপর টর্চের আলো ফেলে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে আবার, আঙুলের ডগা দিয়ে নাক চেপে। গন্ধটা ক্রমশ বাড়ছে। বমি পাচ্ছে তার। হাঁটার গতি আরও কমে গেল। তারপর টর্চের আলোয় পথের ওপর পড়ে থাকতে দেখল একটা লাশ। হায়দারের বুকের ভেতর লাফিয়ে উঠল হৃৎপিণ্ড, আতঙ্কে ঠাণ্ডা হয়ে এল হাত-পা।

লাশটা একটা মেয়ের। গায়ে কোন কাপড় নেই। নাভির নিচে

থেকে বুকের হাড় পর্যন্ত পেটটা চেরা। কালচে, জমাট বাঁধা রক্তের সঙ্গে শরীরের পাশে পড়ে রয়েছে নাড়িভুঁড়ি।

চোখ বুজে ঘুরল হায়দার, পথের কিনারায় দাঁড়িয়ে ঝোপের ওপর বমি করল। কয়েক মুহূর্ত স্থির দাঁড়িয়ে থাকল সে, তারপর টলতে টলতে বাড়িটার দিকে ফিরে আসছে।

হায়দার নক করতে একটা জানালা খুলে তসলিমা প্রথমে দেখে নিল কে এসেছে, তারপর দরজা খুলে দিল। 'কি ব্যাপার? ফিরে এলে যে? এমন হাঁপাচ্ছ কেন?'

'বাইরে একটা···মেয়ে পড়ে আছে···লাশ! নিশ্চয়ই কোন ম্যানিয়াকের কাণ্ড। পেটটা চেরা। উফ, সে যে কি বীভৎস দৃশ্য···'

হায়দারের গায়ের ওপর ঝুঁকে পড়ল তসলিমা। 'কি সব প্রলাপ বকছ!'

'আমার কথা শুনতে পাচ্ছ না?' চেঁচিয়ে উঠল হায়দার। 'একটা মেয়েকে খুন করা হয়েছে। লাশটা সরু পথের ওপর পড়ে আছে–নাড়িভুঁড়ি সব বেরিয়ে পড়েছে। এখুনি আমাদের পুলিসকে জানাতে হবে।'

স্থির হয়ে গেল তসলিমা। হায়দারকে খুঁটিয়ে লক্ষ করছে সে–হাত কাঁপছে, মুখে ঘাম, ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলছে। ছুটে গিয়ে এক গ্লাস পানি আনল। 'এক ঢোক পানি খেয়ে শান্ত হয়ে বসো এখানে,' হাত ধরে টেনে এনে ড্রইংরুমের সোফায় হায়দারকে বসিয়ে দিল। হায়দারের পানি খাওয়া শেষ হতে আবার বলল, 'ঠিক আছে, বুঝলাম–বাইরে একটা মেয়ের লাশ পড়ে আছে। কিন্তু ওটার সঙ্গে তোমার বা আমার কোন সম্পর্ক নেই। খুন তো এরকম রোজই দু'একটা হচ্ছে, তাতে আমাদের কি! যাও, তুমি তোমার বাড়িতে ফিরে যাও।'

'কিভাবে যাব? যেতে হলে লাশটাকে পাশ কাটাতে হবে! তা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'গাড়ির কাছে পৌঁছুনোর আরও রাস্তা আছে,' বলল তসলিমা। 'বাড়ি থেকে বেরিয়ে উল্টোদিকে যেতে হবে, তারপর জলার কিনারা ধরে ঘুরপথ ধরতে হবে। উল্টোদিকে বেশি দূর যেয়ো না, বস্তির লোকজন দেখে ফেলতে পারে। না, তোমাকে একা ছাড়া যাবে না, চলো তোমাকে আমি গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি।' শাড়ির ওপর একটা শাল চড়াল সে। 'এসো।'

হাতঘড়ি দেখল হায়দার। আটটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি। 'অনেক দেরি হয়ে গেছে, তসলিমা। হাটখোলা থেকে শাহানাকে নিয়ে মহাখালি পৌঁছুতে প্রায় দশটা বেজে যাবে। এত দেরি হলো কেন জিজ্ঞেস করলে কি বলব তাকে?'

'পাগলামি কোরো না!' ধমক দিল তসলিমা। 'শাহানাকে ফোন করো। বলো, গাড়িটা হঠাৎ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় পৌঁছুতে দেরি হচ্ছে। তারপর সোজা বাড়ি ফিরে যাও। তাড়াতাড়ি করো, তাড়াতাড়ি করো!'

বাড়িতে ফোন করল হায়দার, কিন্তু অপরপ্রান্তে কেউ রিসিভার তুলছে না। এরপর মহাখালিতে, ভায়রার বাসায় ফোন করল সে। জানা গেল, তার ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে শাহানা একাই একটা ট্যাক্সি নিয়ে মহাখালিতে পৌঁছেছে। স্ত্রীকে লাইনে পেয়ে পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করল সে। গাড়িটা হঠাৎ বিগড়ে যাওয়ায় শ্যামলির একটা গ্যারেজে আসতে হয়েছে তাকে, মেরামতের কাজ শেষ হলেই সরাসরি মহাখালি চলে যাবে। শাহানা বলল, 'বেশি দেরি কোরো না, প্লীজ। এরা সবাই তোমার অপেক্ষায় বসে আছে। তুমি না আসা পর্যন্ত খাবার টেবিলে বসতে চাইছে না।'

'ঠিক আছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আসছি আমি,' বলে যোগাযোগ কেটে দিল হায়দার।

'এবার চলো, তোমাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসি...'

'কিন্তু লাশটা...তসলিমা, পুলিসকে অবশ্যই আমাদের খবর দেয়া উচিত!'

'দারা! ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করো। পুলিসকে খবর দিতে চাও? তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে? তারা জিজ্ঞেস করবে, এখানে তুমি কি করছিলে। কেউ বিশ্বাস করবে দুপুরে খেতে এসে রাত আটটা পর্যন্ত আমার সঙ্গে ছিলে তুমি? তোমার স্ত্রীকেই বা কি বলবে? আর বাপ্পিকে? বাপ্পি যদি জানতে পারে তার মেয়ের সঙ্গে তারই একজন কর্মচারী নির্জন একটা বাড়িতে পাঁচ-সাত ঘণ্টা কাটিয়েছে, কি ঘটবে কল্পনা করতে পারো? চাকরিটা হারাতে চাও? শাহানাকে হারাতে চাও? জোর করে বলতে পারো, সব কথা শোনার পর সে তোমাকে ডিভোর্স করতে চাইবে না? চিন্তা করো, ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করো!'

মাথার চুলে ঘন ঘন আঙুল চালাচ্ছে হায়দার। ওহ্, খোদা! এ কি বিপদে জড়িয়ে পড়ল সে!

তার হাত ধরে আবার টান দিল তসলিমা। 'এসো!'

হায়দার কিছু ভাবতে পারছে না, নিজেকে যেন তসলিমার হাতে তুলে দিল। বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে ছুটল তসলিমা, হায়দারের একটা হাত শক্ত করে ধরে আছে। জলার কাছে চলে এল ওরা, ঘুরপথ ধরে গাড়ির দিকে যাচ্ছে। এদিকে প্রচুর ঝোপ-ঝাড়, অন্ধকারে মনে হলো লোকজন ওত পেতে বসে আছে। লাশটার কাছাকাছি চলে এসেছে ওরা, বুঝতে পারল হায়দার। ডান দিকে তাকালে চোখে পড়ে যেতে পারে, এই ভয়ে সেদিকে

তাকাচ্ছেই না। সরু মেঠো পথে বাঁক নিতেই ছ্যাঁৎ করে উঠল তার বুক। লম্বা ছিপছিপে এক তরুণ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল সদ্য মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসা চাঁদের ধবধবে আলোয়, মাথাভর্তি কোঁকড়ানো চুল কাঁধ পর্যন্ত লম্বা। পরনে ছেঁড়াফাটা একটা জিনস, কাঁধ থেকে ঝুলছে ধূসর রঙের সুতি কাপড়ের ব্যাগ। ওদেরকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল তরুণ। 'আচ্ছা, বলতে পারেন, কল্যাণপুর বস্তিটা কোন্ দিকে?'

জোর করে হাসল তসলিমা। হাত তুলে পিছন দিকটা দেখাল। 'ওদিকে।'

ওদেরকে খুঁটিয়ে লক্ষ করল তরুণ, তবে আর কোন প্রশ্ন না করে চলে গেল।

'ও আমাদেরকে চিনে রাখল,' ফিসফিস করল হায়দার।

'বেকার ভবঘুরে,' আশ্বস্ত করল তসলিমা, 'নিজের চিন্তায় পাগল হয়ে আছে। শুধু শুধু ভয় পেয়ো না তো।'

পিছন দিকে ঘাড় ফেরাল হায়দার। খানিক দূর এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে তরুণ, ওদেরকে দেখছে। 'আহ্, পিছনে কেন তাকাচ্ছ! এসো!' তবে নিজেও এবার পিছনে তাকাল। তরুণ চলে যাচ্ছে।

'কয়েক পা এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল তসলিমা। ওই গাছগুলোর আড়ালে তোমার গাড়ি পাবে,' বলল সে, আশপাশে কেউ নেই দেখে হায়দারের গলাটা দু'হাতে জড়িয়ে ধরল। 'সময়টা আমাদের দারুণ কেটেছে, কি বলো?'

শিউরে উঠে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল হায়দার। 'ভুল যা করার করেছি, অফিস ছাড়া কোথাও আর আমাদের দেখা হবে না।'

'সবাই এরকম বলে,' হেসে উঠে বলল তসলিমা। 'কিন্তু পরে

আর লোভ সামলাতে পারে না।' হায়দারের কাঁধে একটু চাপ দিয়ে ঘুরল সে, ছুটে ফিরে যাচ্ছে নিজের বাড়িতে।

দুই

শখের গোয়েন্দা শহীদ খান নাস্তার টেবিলে বসে খবরের কাগজটা হাতে নিতেই যেন লাফ দিয়ে চোখে উঠে এল বীভৎস ছবিটা। শিরোনামে লেখা হয়েছে– 'কল্যাণপুরে নৃংশস খুন–পুলিস বলছে কোন ম্যানিয়াকের কাণ্ড।'

নাস্তার টেবিল ছেড়ে ড্রইংরুমে চলে এল শহীদ, সোফায় বসে খবরটা পড়ল। অজ্ঞাতপরিচয় এক লোক রাত আটটার দিকে টেলিফোনে মীরপুর থানাকে জানায়, পাইকপাড়া থেকে কল্যাণপুর বস্তিতে যাবার পথে একটা মেয়ের লাশ পড়ে আছে। পুলিসের কোন প্রশ্নের জবাব না দিয়ে লোকটা ফোন রেখে দেয়। পুলিস অকুস্থলে পৌঁছায় রাত ন'টায়, সঙ্গে ডাক্তার, ফটোগ্রাফার ও সাংবাদিকরা ছিল। লাশ পরীক্ষা করে ডাক্তার জানিয়েছেন, বিকেল পাঁচটা থেকে ছ'টার মধ্যে খুন করা হয়েছে মেয়েটাকে। প্রথমে মাথায় আঘাত, তারপর গলা টিপে ধরে রেপ, সবশেষে ধারাল ছুরি বা ক্ষুর দিয়ে পেট চেরা হয়। পুলিসের ধারণা, হয় কোন উন্মাদ নয়তো কোন স্যাডিস্ট ম্যানিয়াক দায়ী। মেয়েটির পরিচয় জানার জন্যে কাল রাতেই কল্যাণপুর বস্তিতে খোঁজ নিতে

গিয়েছিলেন ইন্সপেক্টর মিনহাজ হোসেন। বস্তির মালিক রুস্তম বেপারি লাশের ছবি দেখে জানিয়েছে মেয়েটির নাম শ্যামলি, দিন কয়েক আগে বস্তির একটা ঘর ভাড়া নিয়েছিল। পুলিস সন্দেহ করছে, শ্যামলি পতিতা ছিল, টানবাজার পতিতালয় থেকে বিতাড়িত হয়ে কল্যাণপুরের বস্তিতে আশ্রয় নেয়। ইন্সপেক্টর মিনহাজ হোসেন সাংবাদিকদের আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, তদন্তে কোন গাফলতি করা হবে না, আশা করা যায় খুব শিগগিরই ধরা পড়বে খুনী। তবে সাংবাদিকদের ভাষ্য হলো, পুলিসের হাতে এখনও কোন সূত্র নেই।

ছবিটা দেখে নাস্তা খাবার রুচি নষ্ট হয়ে গেছে শহীদের, মহুয়া জেদ ধরায় সেদ্ধ একটা ডিম আর এক কাপ চা খেয়ে অফিসে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। কাপড় পরা শেষ হয়েছে, এই সময় ওর রুমাল, কলম, নোটবুক আর মানিব্যাগ নিয়ে ঘরে ঢুকল মহুয়া। শহীদকে চিন্তিত ও অন্যমনস্ক দেখে কিছু বলতে যাবে, কিন্তু বলা হলো না, টুং টুং করে বেজে উঠল কলিংবেলটা। 'এত সকালে আবার কে এল,' বলে ড্রইংরুম থেকে বেরিয়ে প্যাসেজ হয়ে ফ্ল্যাটের দরজা খুলতে চলে এল সে।

দরজা খুলতেই হকচকিয়ে গেল মহুয়া। সামনে দাঁড়িয়ে শ্মশ্রুমণ্ডিত ও জটাধারী এক ভিখারি, শরীরটা প্রকাণ্ড। মহুয়ার সামনে লোমশ একটা হাত পাতল, কর্কশ হুকুমের সুরে বলল, 'দে, দশটা টাকা দে!'

মহুয়ার ইচ্ছে হলো পিছিয়ে এসে এক ঝটকায় দরজাটা বন্ধ করে দেয়, কিন্তু ভিখারি যেন তাকে সম্মোহিত করে ফেলেছে, চোখ বড় বড় করে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল।

'দিবি, নাকি চলে যাব?' হুমকির সুরে জিজ্ঞেস করল ভিখারি।

লাল চোখে ক্রোধ।

হাতে শহীদের মানিব্যাগটা রয়েছে, দম দেয়া পুতুলের মত সেটা থেকে পাঁচ টাকার একটা নোট বের করে ভিখারির বাড়ানো হাতের তালুতে রাখল সে।

নোটটা ডান হাত থেকে বাম হাতে নিল ভিখারি, মুচড়ে দলা পাকাল, তারপর ছুঁড়ে দিল প্যাসেজের মেঝেতে, বলল, 'দশ টাকার জন্যে এলাম, দিলি পাঁচ টাকা–আল্লাহ্ তোদের ভাল করুন!' বলে আর দাঁড়াল না, সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নেমে গেল।

এতক্ষণে মহুয়ারও যেন ঘোর ভাঙল, তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ করে টাকাটা কুড়াল সে, প্রায় ছুটে ফিরে এল ড্রইংরুমে, কি ঘটেছে বলল শহীদকে।

'বেশি ভিক্ষা পাবার এ এক ধরনের কৌশল,' হেসে উঠে বলল শহীদ, মহুয়ার হাত থেকে মানিব্যাগটা নিল। ওর হাতে দলা পাকানো নোটটাও গুঁজে দিল মহুয়া।

নোটটার ভাঁজ খুলছে শহীদ, ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একটা চিরকুট। 'আরে, একি!' মহুয়ার দিকে তাকাল ও। 'টাকার ভেতর কাগজ এল কিভাবে?' কাগজটা ভাঁজ করা। সেটা খুলতে দেখা গেল কয়েকটা লাইন লেখা রয়েছে, হস্তাক্ষর অতি পরিচিত। শুধু চিরকুট নয়, কাগজের সঙ্গে একটা তামার বোতামও রয়েছে।

হাতের লেখা মহুয়াও চিনতে পারল। 'ও মা, দাদা এসেছিলেন!' হাসতে হাসতে বিছানায় শুয়ে পড়ল সে। 'কি আশ্চর্য, চিনতেই পারলাম না! কি লিখেছেন গো?'

শহীদ লক্ষ করল, বোতামটা সাধারণ কোন বোতাম নয়, অন্তত এরকম বোতাম আগে কখনও দেখেনি ও। 'পড়ছি,

শোনো।'

কুয়াশা লিখেছে, 'প্রিয় শহীদ, কল্যাণপুরে একটা মেয়ে খুন হয়েছে, সকালের কাগজে খবরটা নিশ্চয়ই তুমি পড়েছ। ঘটনাচক্রে অকুস্থল থেকে পুলিস চলে আসার পর অন্য একটা কাজে ওদিকে আমাকে যেতে হয়েছিল। পুলিসের কাজে অনেক খুঁত থাকে, তাই ভাবলাম খুঁজে দেখি তো কোন ক্লু পাই কিনা। বেশ কিছুক্ষণ খোঁজার পর একটা ঝোপের ভেতর এই বোতামটা পেলাম। এরকম বোতাম আগে কখনও চোখে পড়েনি, তবে খুনটার সঙ্গে এটার সম্পর্ক থাকতেও পারে, আবার না-ও থাকতে পারে। আনকমন বোতাম, তুমি একটু খোঁজ নিয়ে দেখতে পারো। লাশের যে বর্ণনা কাগজে পড়লাম, একজন ম্যানিয়াকের কাজ বলে মনে হচ্ছে। আমার সন্দেহ, খুনীকে তাড়াতাড়ি ধরা না গেলে আরও খুন করবে সে। অবসর সময়ে আমি টেলিপ্যাথী চর্চা করছি, দেখা যাক তোমাকে আরও কোন ক্লু দিতে পারি কিনা। তোমাদের সবাইকে আমার স্নেহ ও শুভেচ্ছ। ইতি, কুয়াশা।'

'বুঝতে পারছ তো, মহুয়া, আমি যা সন্দেহ করেছিলাম, সেটাই সত্যি,' চিরকুট আর বোতাম পকেটে রেখে দিয়ে বলল শহীদ।

'কি সন্দেহ করেছিলে?' বিছানার ওপর উঠে বসল মহুয়া।

'কেন, ভুলে গেছ? বেশ কিছু দিন থেকে আভাস পাচ্ছি, কুয়াশা জেনেটিক এঞ্জিনিয়ারিং-এর ওপর গবেষণা করছে। আমার সন্দেহ মানুষ ক্লোন করার চেষ্টা করছে সে। কোথায় থাকে না থাকে সেজন্যেই কাউকে জানতে দিচ্ছে না। এখানে আজ ছদ্মবেশ নিয়ে আসার পিছনেও ওই একই কারণ।'

'কেন, মানুষ ক্লোন করা অপরাধ নাকি?' বড় ভাই-এর পক্ষ

নিয়ে তর্ক করার জন্যে তৈরি হয়ে গেল মহুয়া।

শহীদ সাবধানে বলল, 'অপরাধ কিনা জানি না, তবে নীতিগতভাবে নিষেধ। আমেরিকা, জাপান, ফ্রান্স ছাড়াও কয়েকটা দেশ আইন করে মানুষ ক্লোন নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।'

'জানি,' বলল মহুয়া। 'কিন্তু আমাদের সরকার সেরকম কিছু ঘোষণা করেনি, ক্লোনিং-এর বিরুদ্ধে কোন আইনও জারি করা হয়নি।'

হেসে উঠে শহীদ জানতে চাইল, 'তুমি কি মানুষ ক্লোন করার পক্ষে?'

মহুয়া জবাব দিল, 'আমি দাদার পক্ষে। দাদা যদি সিদ্ধান্ত নেন মানুষ ক্লোন করা ক্ষতিকর নয়, আমি তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে নেব।'

'আচ্ছা, ধরো, কেউ যদি তোমাকে বলে আমি আসল শহীদ নই, শহীদের ক্লোন, তোমার কেমন লাগবে?' সকৌতুকে জানতে চাইল শহীদ। 'আসল শহীদ ফিরে এলে কি বলবে তাকে?'

ঘুসি বাগিয়ে ছুটে এল মহুয়া। 'অসভ্য কোথাকার! দাঁড়াও, মজা দেখাচ্ছি...'

টেলিফোনটা বেজে ওঠায় রণে ভঙ্গ দিল মহুয়া। হাত তুলে আত্মসমর্পণের ভঙ্গি করেছিল শহীদ, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ফোনের রিসিভার তুলল। 'হ্যালো?'

অপরপ্রান্ত থেকে ওর সহকারী কামাল আহমেদ জানতে চাইল, 'খবরটা পড়লি?'

এগিয়ে এসে শহীদের টাইয়ের নটটা বেঁধে দিচ্ছে মহুয়া। রিসিভারে শহীদ বলল, 'শুধু পড়েছি! ঘরে বসে একটা ক্লুও পেয়ে গেছি। শোন, কামাল, তুই অফিসে না গিয়ে মীরপুর থানায় চলে যা। কেসটা সম্পর্কে ওদের পাওয়া তথ্যগুলো জানার চেষ্টা কর।

তারপর কল্যাণপুর বস্তিতে চলে যা। ওখানেই তোর সঙ্গে আমার দেখা হবে।'

'ঠিক আছে,' বলে যোগাযোগ কেটে দিল কামাল।

'আপনিই তাহলে এই বস্তির মালিক, রুস্তম বেপারি?' জিজ্ঞেস করল শহীদ।

মধ্যবয়স্ক লোকটা মাদুর পাতা বারান্দায় হাঁটুর ওপর নোংরা লুঙ্গি গুটিয়ে বসে আছে, গায়ে ছেঁড়া গেঞ্জি, মাথায় একটা কিস্তি টুপি। বারান্দার এক ধারে মাটির চুলোয় রান্না করছে এক যুবতী, গায়ে ব্লাউজ নেই। উঠানে মাছ কুটছে আরেক যুবতী, এলো চুল পিঠে ছড়ানো, তার মাথা থেকে উকুন বেছে বের করছে প্রৌঢ়া আরেক মহিলা।

'দুরো!' ক্ষোভ ও তাচ্ছিল্য প্রকাশের সুরে বলল রুস্তম বেপারি। 'কি কন! দুই হাজার ঘর, মাসে আশি-নব্বুই হাজার টেহা ইনকাম–আমারে দেইখা মনে হয় আমি এই বস্তির মালিক? কি কামে আইছেন হেইডা কন, আজাইরা প্যাঁচাল পাইরেন না। হুনেন নাই, কাল রাইতে এদিকে একটা মাইয়ামানুষ মাডার হইছে?'

'ওই খুনের ব্যাপারেই এসেছি আমরা,' বলল কামাল। বস্তির বাইরে অপেক্ষা করছিল সে, শহীদ পৌঁছুতে একসঙ্গে ভেতরে ঢুকেছে।

'খুনের ব্যাপারে আইছেন?' চোখ বড় বড় করল রুস্তম বেপারি। 'মাইনে?'

শহীদ বলল, 'আমরা প্রাইভেট ডিটেকটিভ, সরকারের অনুমতি নিয়ে খুন-খারাবি তদন্ত করি। শ্যামলি মেয়েটা সম্পর্কে

আপনারা যে যা জানেন সব বলুন।'

'পুলিস তো কাল রাইতেই সব শুইনা গেছে, থানায় গিয়া জাইনা নেন,' জবাব দিল রুস্তম বেপারি।

'আমাদের কাজের পদ্ধতি আলাদা,' বলল শহীদ। 'পুলিসের সঙ্গে মেলে না। সাধারণত আমরাই পুলিসকে তথ্য দিয়ে সাহায্য করি। এখন আপনি বলবেন কি, শ্যামলি কবে থেকে এই বস্তিতে ছিল?'

'কি য্যান পরিচয় দিলেন...প্রায়ভেট...ভেট?' হলুদ দাঁত বের করে হেসে উঠল রুস্তম বেপারি। 'বুঝছি–ভেট চান!' হঠাৎ চোখ গরম করল সে। 'যান, ভাগেন, পাইবেন না! ভেট আমরা মন্ত্রী, এমপি, মাস্তান আর পুলিসের দেই। আপনে কেডা?'

'আপনি ভুল করছেন,' ধৈর্য না হারিয়ে বলল শহীদ। 'আমরা আপনার কাছে ভেট নিতে আসিনি। এসেছি তথ্য সংগ্রহ করতে। আপনি চান না খুনী ধরা পড়ুক? লাশটা দেখেছেন নিশ্চয়ই? দেখে মনে হয়নি, খুনী একটা পাগল? ওই লোক আবার খুন করবে। আমি বলতে চাইছি, যা জানেন খুলে বললে আপনাদেরই উপকার।'

'আপনেরা মনে হয় এনজিও। অই, টেপির মা, দুই খান মোড়া আইনা দে, ভদ্দরলোকেরা বইসা কথা কন।' কান থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরাল রুস্তম বেপারি।

উকুন বাছছিল যে মহিলা, উঠে গিয়ে ঘর থেকে দুটো মোড়া এনে দিল। শহীদ জানতে চাইল, 'এরা আপনার কে হন?'

'আমার চার বিবি, আপনেরা তিনজনেরে দেখতাছেন,' এক গাল হেসে বলল রুস্তম বেপারি। 'মাইজা বিবি গোস্যা কইরা বাপের বাড়ি চইলা গেছে।' হঠাৎ গম্ভীর হলো সে। 'প্যাঁচাল পাইরা

আমার টাইম নষ্ট কইরেন না। কি জানবার চান কইয়া ফালান।'

'শ্যামলি কবে থেকে...'

'কাল বিকালে বস্তির একটা ঘর ভাড়া নেয় মাইয়াডা,' শহীদের প্রশ্ন শেষ হবার আগেই জবাব দিতে শুরু করল রুস্তম বেপারি। 'পুরুষ পুরুষ ভাব, চ্যাটাং চ্যাটাং কতা, আমার পছন্দ হয় নাই। সন্ধ্যার পর ঘর থেইকা বাইর হইতাছে দেইখা জিগাইলাম, কই যাও? কইল, আমার যেহানে খুশি। বুঝলাম, খদ্দের ধরতে যাইতাছে।'

'ওর ঘরটা আমরা একবার দেখতে চাই,' বলল শহীদ। 'সেটা কোন দিকে?'

'টেপির মা, সাহেবগো শ্যামলির ঘরটা দেহায়া দাও,' হুকুম করল রুস্তম বেপারি। শহীদ ইঙ্গিত করতে টেপির মায়ের পিছু নিয়ে বস্তির আরেক দিকে চলে গেল কামাল।

'আপনাদের বস্তিতে এমন কেউ আছে, যাকে আপনার খুনী বলে সন্দেহ হয়?' ওরা চলে যেতে রুস্তম বেপারিকে প্রশ্ন করল শহীদ।

'আমি কি খোদা, মাইনষের মনের খবর রাখুম? আমগো বস্তিতে চোর আছে, ছিনতাইকারী আছে, মাস্তান আছে। আমরাও চিনি, পুলিসও চিনে। কিন্তু খুনী আছে কিনা কেমনে জানুম? যে মানুষ মারে হে কি কাউরে দেখায়া মারে?'

'বস্তিতে নতুন কেউ এসেছে? কাল বা পরশু?'

রুস্তম বেপারিকে অবাক হতে দেখল শহীদ। 'এইডা তো ইন্সপেক্টর সাবে জিগান নাই!'

'এসেছে তাহলে? কখন?' জানতে চাইল শহীদ।

'খুন হওনের অনেক পরে,' বলল রুস্তম বেপারি। 'এই ধরেন

রাইত নয়টার দিক।'

'কি নাম তার? এখন সে কোথায়?'

মাথা নাড়ল বেপারি। 'হুনেন সাহেব, আমি মানুষ চিনি। চোর-ছ্যাচ্চড় কিনা কইতে পারুম না, কিন্তু এই ছোকরা খুনী না।'

'আমি কি বলেছি সে খুনী? কথা বলে দেখতে চাই, সে হয়তো কোন তথ্য দিতে পারবে।'

এই সময় কামাল ফিরে এল, তাকে সঙ্গে নিয়ে রুস্তম বেপারির পিছু ধরল শহীদ। কামাল নিঃশব্দে মাথা নেড়ে জানিয়ে দিল শ্যামলির ঘরে কোন সূত্র পাওয়া যায়নি। বস্তির বাচ্চারা ছেলে-মেয়েরা ওদের পিছু নিয়েছে, বেশিরভাগই উদোম গা, হাড্ডিসার কাঠামো। ড্রেন নেই, পথের ওপরই নোংরা পানির স্রোত বইছে। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, এই নোংরা পরিবেশে, দু'একটা বেড়ার ঘরের ভেতর, ক্যাবল লাইন সহ রঙিন টিভিও চলছে। একটা ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে হাঁক ছাড়ল রুস্তম বেপারি, 'অই মিয়া, শওকত, দরজা খুইলা বাইর হও।'

বেশ কয়েকবার ডাকাডাকি করতে দরজা খুলে ছিপছিপে রোগা এক তরুণ বেরিয়ে এল, হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ রগড়াচ্ছে। খালি গা, এত বেলা পর্যন্ত জিনসের প্যান্ট পরেই ঘুমাচ্ছিল। প্রথমেই শহীদের নজরে পড়ল তরুণের মাথাভর্তি কোঁকড়ানো চুল, কাঁধের ওপর স্তূপ হয়ে আছে। 'ইনারা পুলিসের জাতভাই,' রুস্তম বেপারি বলল। 'তোমার লগে কতা কইতে চান।'

'কি কথা?' হঠাৎ সজাগ দেখাল শওকতকে।

'আপনি সরে দাঁড়ান, আপনার ঘরটা আমরা সার্চ করব,' একটু কঠিন সুরে বলল শহীদ। 'জানেনই তো, কাল রাতে বস্তির

পাশে একটা মেয়ে খুন হয়েছে, আমরা সে-ব্যাপারেই তদন্ত করতে এসেছি।'

'তদন্ত করবে পুলিস, আপনারা কে?' দরজা ছেড়ে নড়ল না শওকত। বস্তিতে উঠলেও, তরুণ মূর্খ নয়, পেটে খানিকটা হলেও বিদ্যা আছে বলে মনে হয়। চেহারা দেখে বোঝা যায়, অত্যন্ত সতর্ক। চোখেও অশুভ কি যেন একটা আছে।

'আমরা প্রাইভেট ডিটেকটিভ।'

'প্রাইভেট ডিটেকটিভের কাছে সার্চ ওয়ারেন্ট থাকে না,' বলল শওকত। 'আমি অনুমতি না দিলে আপনারা আমার ঘর সার্চ করতে পারেন না।'

'তা পারি না, তবে আপনাকে আমরা অ্যারেস্ট করতে পারি,' বলল শহীদ। 'আপনি কি তাই চান?'

কি যেন বলতে গিয়েও বলল না শওকত, পিছিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকল সে। রুস্তম বেপারি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকল, ঘরে ঢুকল শহীদ আর কামাল। ছোট একটা চৌকি ছাড়া ভেতরে আর কিছু নেই। চৌকির ওপর শুধু মাদুর পাতা। বালিশ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে সুতি কাপড়ের একটা ব্যাগ। কামালকে বলতে হয়নি, ভেতরে ঢুকেই সার্চ শুরু করে দিয়েছে সে। তবে সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া গেল না।

শহীদ জেরা শুরু করল, 'কাল রাত ন'টার দিকে বস্তিতে আসেন আপনি। লাশটা যেখানে পাওয়া গেছে, ওদিক থেকেই এসেছেন বলে শুনলাম।'

দোরগোড়া থেকে রুস্তম বেপারি ভাবল, বাহ্, পুলিসের লগে ইনাদের কত্ত ফারাক! কতা বাইর করনের লাইগা বালাই প্যাঁচ মারতে জানেন!

একটু থতমত খেয়ে গেল শওকত, বলল, 'হ্যাঁ, ওদিক থেকেই এসেছি। তাতে কি হলো?'

'ওদিক থেকে মানে কোনদিক থেকে, একটু ব্যাখ্যা করে বলুন,' জিজ্ঞেস করল শহীদ।

'আমি শ্যামলি থেকে জলায় নামি, খাল ঘুরে বস্তিতে আসি।'

'লাশটা দেখে কি মনে হলো আপনার?'

'আমি কোন লাশ দেখিনি,' তাড়াতাড়ি বলল শওকত।

'না দেখার তো কথা নয়। পথের ওপরই পড়ে ছিল ওটা,' বলল শহীদ। 'লাশ যদি দেখে না থাকেন, খুনীকে তো অবশ্যই দেখেছেন। পথের ওপর লাশটা রেখে ওই জলা দিয়েই ফিরে গেছে খুনী।'

'আপনি শুধু শুধু আমাকে বিপদের ফেলার চেষ্টা করছেন,' বলল শওকত, তবে মনে মনে ভাবছে–এক ভদ্রলোক আর এক ভদ্রমহিলাকে দেখেছি, কিন্তু তাদেরকে তো খুনী বলে মনে হয়নি! 'আমি কাউকে দেখিনি।'

'আপনার দেশের বাড়ি কোথায়? ঢাকায় কবে এসেছেন? আসার উদ্দেশ্য কি? লেখাপড়া কতদূর? বাবা কি করেন?'

নোটবুক বের করে তৈরি হয়েই ছিল কামাল, শওকতের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দ্রুত লিখে নিচ্ছে।

সকালে আধ ঘণ্টা আগে অফিসে পৌঁছে কাজ শুরু করল হায়দার। তসলিমা এল ঠিক ন'টায়। আজ আবার সে স্কিন-টাইট জিনস পরে এসেছে, গায়ে পপলিনের সাদা শার্ট। ভেতরে ঢুকে চোখ নাচিয়ে সহাস্যে বলল, 'হাই, দারা ভাই! কোন সমস্যা হয়নি তো?'

'সারারাত শাহানার মুখ ঝামটা সহ্য করতে হয়েছে,' গম্ভীর সুরে বলল হায়দার।

'ছুটির দিন কোথাও বেড়াতে নিয়ে গিয়ে পুষিয়ে দিয়ো,' পরামর্শ দিল তসলিমা। 'কাল খুব মজা করেছি আমরা, কি বলো? সুযোগ পেলে আবার করব, হ্যাঁ?'

'না!' কঠিন সুরে বলল হায়দার, কয়েকটা চুক্তিপত্র বাড়িয়ে দিল তসলিমার দিকে। 'এগুলো রেকর্ড করে রাখো। বাকিগুলো আমি দেখছি।'

হেসে উঠে তসলিমা বলল, 'কাজের সময় কাজ, তাই না? ভেরি গুড, কাজকে আমি ভয় পাই না।'

কথাটা সত্যি। কাজে একবার মন বসাবার পর তসলিমা মুখ তুলে একবার তাকাচ্ছেও না। এদিকে হায়দার কাজে মন বসাতে পারছে না। তার একটাই চিন্তা, তসলিমার হাত থেকে বাঁচার কি উপায় করা যায়। যেভাবেই হোক একটা বুদ্ধি বের করতে হবে, কোম্পানির মালিক নেসার আহমেদ যাতে মেয়েকে হেড অফিসে ডেকে নেন।

হঠাৎ একসঙ্গে অনেক লোকের গলা শুনে সংবিৎ ফিরে পেল সে। মুখ তুলে কাঁচের দেয়ালের দিকে তাকাতেই দেখল দশ-বারোজন লোক ওয়েটিং রুমে ঢুকে পিয়নের সঙ্গে কথা বলছে। দু'জনকে চিনতে পারল হায়দার, কাল অভিভাবকদের সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন। চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল হায়দার, দরজা খুলে ভেতরে আসতে বলল সবাইকে। ওরা এসেছেন যে যার ছেলেমেয়ের জন্যে শিক্ষা-বীমার পলিসি নিতে।

সেই থেকে শুরু হলো হায়দার আর তসলিমার কর্মব্যস্ততা। খেয়ালই থাকল না সকালটা কিভাবে পেরিয়ে গেল। দুপুরে রাস্তার

ওপারের একটা ফাস্টফুডের দোকান থেকে বার্গার এনে লাঞ্চ সারল ওরা। দু'জনেই খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ভাবছে এবার একটু দম ফেলার ফুরসত পাওয়া যাবে। এই সময় অফিসের গেটে একটা পুলিসের জীপ এসে থামল, পিছনে সাদা একটা টয়োটা। জীপ থেকে পুলিসকে নামতে দেখে হায়দারের শিরদাঁড়ায় ঠাণ্ডা হিম একটা অনুভূতি হলো। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মোছার ভান করল সে, আসলে চেহারাটা লুকাবার ব্যর্থ চেষ্টা।

ওয়েটিং রুমে ঢুকলেন ইন্সপেক্টর মিনহাজ হোসেন, পিছু নিয়ে শহীদ ও কামাল।

ইন্সপেক্টর মিনহাজ হোসেনের সঙ্গে শহীদের অ্যাপয়েন্টমেন্টটা কামালই করে রেখেছিল, কল্যাণপুর বস্তি থেকে সরাসরি কামালকে নিয়ে মীরপুর থানায় চলে যায় শহীদ। শ্যামলি মার্ডার কেসে 'ইউনিভার্সেল সার্ভিসেস' অর্থাৎ প্রাইভেট ডিটেকটিভ শহীদ খান নাক গলাচ্ছে, ব্যাপারটা খুশি মনে মেনে নিতে পারেননি ইন্সপেক্টর। তবে তিনি জানেন যে এসপি মি. সিম্পসন শহীদ খানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাছাড়া, আরও একটা ব্যাপারে সচেতন তিনি–সারা দেশে প্রতিভাবান গোয়েন্দা হিসেবে শহীদ খানের বিশেষ একটা পরিচিতি আছে। কাজেই খুশি হতে না পারলেও, শহীদের নাক গলানোটাকে হাসি মুখে মেনে নিতে হয়েছে। থানায় পৌঁছে শহীদই প্রথমে প্রসঙ্গটা তোলে–লাশটা যেখানে পাওয়া গেছে, সেখান থেকে মাত্র পঞ্চাশ কি ষাট গজ দূরে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী নেসার আহমেদের মেয়ের বাড়ি, সেই বাড়ির লোকজনকে খুনটা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে কিনা।

বাড়িটায় যে নেসার আহমেদের মেয়ে তসলিমা থাকে, এ-খবর ইন্সপেক্টর জানেন। সেই সঙ্গে তিনি এ-ও জানেন যে নেসার

আহমেদের সঙ্গে পুলিস কর্মকর্তাদের বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠতা আছে। সে-কারণেই তসলিমাকে প্রশ্ন করার কাজটা তিনি এড়িয়ে গেছেন। শহীদ প্রসঙ্গটা তোলায় তিনি প্রস্তাব দিলেন, 'চলুন তাহলে একসঙ্গেই যাই, দেখা যাক মিস তসলিমা কোন তথ্য দিতে পারেন কিনা।'

ওয়েটিং রুমে থামল না শহীদ, সুইংডোর ঠেলে দ্বিতীয় কামরায় ঢুকে পড়ল। ইন্সপেক্টর মিনহাজ হোসেন নিজের ও শহীদের পরিচয় দিয়ে তসলিমাকে বলল, 'আমরা একটা মার্ডার কেস তদন্ত করছি।' শহীদের দিকে ফিরলেন তিনি, সম্মান দেখিয়ে বললেন, 'মি. শহীদ, আপনিই প্রশ্ন করুন, প্লীজ।'

তসলিমা নিজের ও হায়দারের পরিচয় দিল। ইন্সপেক্টর বললেন, 'হায়দার সাহেবকে আমি চিনি।'

'কাল রাতে আপনার বাড়ি থেকে খানিক দূরে একটা মেয়ে খুন হয়েছে,' তসলিমাকে বলল শহীদ।। 'ওই সময় আপনি কি বাড়িতে ছিলেন?'

'বাড়িতে থাকব না তো কোথায় থাকব!' হেসে উঠে বলল তসলিমা। 'অবশ্যই ছিলাম।'

'বাড়িতে আপনার সঙ্গে আর কে ছিল?'

'কেউ না, কারণ ছুটির দিন চাকরবাকরদের আমি কাজ করাই না। দুপুর পর্যন্ত অফিস করি, তারপর একাই ছিলাম বাড়িতে।'

তসলিমার আঁটসাঁট কাপড়ের ওপর চোখ বুলাল শহীদ। 'কোন আওয়াজ শুনেছেন? চিৎকার? ধস্তাধস্তি?'

'টিভি দেখছিলাম। কেউ চিৎকার করলেও শুনতে পাবার কথা নয়,' হাসিমুখে বলল তসলিমা।

শহীদের ঠোঁটেও ক্ষীণ একটু হাসির রেখা ফুটল। 'টিভিতে কি

দেখছিলেন, মিস তসলিমা?'

চোখ মিটমিট করল তসলিমা। শহীদ বুঝতে পারল, মেয়েটা সত্যি কথা বলছে না। 'বত্রিশটা চ্যানেল, কখন কি দেখেছি মনে রাখা সম্ভব, আপনিই বলুন? ব্যাপারটা কি খুব গুরুত্বপূর্ণ, মি. শহীদ খান?'

'কোন গাড়ির আওয়াজ পেয়েছিলেন?'

'একবার তো বললামই, আমি কিছু শুনিনি। মেয়েটা কে বলুন তো? কিভাবে খুন হলো?'

তসলিমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে শহীদ। 'মেয়েটাকে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে খুন করা হয়েছে, মিস তসলিমা। আপনার ভালর জন্যেই বলছি, খুনী ধরা না পড়া পর্যন্ত বাড়িটায় ভুলে কখনও একা থাকবেন না।'

'কি সাংঘাতিক! আপনি ব-,তে চাইছেন সে আরও খুন করবে?' চোখ বড় বড় করল তসলিমা।

'আমাদের তাই ধারণা,' বলল শহীদ। 'এখনও আপনি নিজের বক্তব্যে অটল থাকবেন–কাউকে আপনি দেখেননি, কোন আওয়াজও শোনেননি?'

মাথা নাড়ল তসলিমা। তারপর পাল্টা প্রশ্ন করল, 'মিথ্যে কথা বলে আমার কি লাভ?'

'ধন্যবাদ,' বলে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল শহীদ, ওর পিছু নিয়ে ইন্সপেক্টরও।

ওরা চলে যেতে হায়দার ফিসফিস করে বলল, 'এক ছোকরা আমাদেরকে দেখেছে, তসলিমা! মাথায় এক রাশ কোঁকড়ানো চুল। পুলিস বা ডিটেকটিভ তাকে পেয়ে যদি জেরা করে, প্রমাণ হয়ে যাবে তুমি মিথ্যে কথা বলেছ।'

'আমি নেসার আহমেদের মেয়ে,' শান্ত সুরে বলল তসলিমা। 'পুলিস আমার কথা বিশ্বাস করবে, নাকি একজন বেকার ভবঘুরের কথা?' চেয়ারে নড়েচড়ে বসে কম্পিউটরের বোতাম টিপতে শুরু করল সে।

টয়োটায় চড়ে নিজেদের অফিসে যাবার পথে কামালকে শহীদ বলল, 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, শওকত কিছু গোপন করছে। লাশটা তার দেখার কথা। ওই পথ দিয়েই বস্তিতে এসেছে সে।'

কামাল বলল, 'তবে ওর কাপড়চোপড়ে রক্তের কোন দাগ আমি পাইনি।'

'সেই খুনী, তা আমি বলতে চাইছি না,' বলল শহীদ। 'তবু সন্দেহের তালিকায় তাকে আমাদের রাখতে হবে। তুই ওর সম্পর্কে খোঁজ-খবর নে। অফিসে পৌঁছেই সাভার থানার সঙ্গে যোগাযোগ কর।'

'ঠিক আছে,' বলল কামাল। 'নেসার আহমেদের মেয়েটার সঙ্গে কথা বলে কি মনে হলো তোর?'

'সে-ও সত্যি কথা বলছে না। আমার ধারণা, বাড়িতে তার সঙ্গে কোন পুরুষ ছিল। ওর সম্পর্কে দু'একটা কথা আগেও আমার কানে এসেছে। খুব বেপরোয়া জীবনযাপন করে। হ্যান্ডসাম ছেলে দেখলে মাথা খারাপ হয়ে যায়। ভাল কথা, অজ্ঞাতনামার টেলিফোন সম্পর্কে পুলিস কি ভাবছে?'

'খসখসে গলা । মাত্র পাঁচ-সাত সেকেন্ড লাইনে ছিল। পুলিস বলছে, ফোনটা খুনীও করে থাকতে পারে। ভাল কথা, শহীদ, কয়েকজন সাংবাদিক তোর সঙ্গে অফিসে দেখা করতে চেয়েছেন–তোর কাছে কোন ক্লু আছে কিনা জানতে চাইবেন।'

'ওদেরকে বোতামটার কথা এখুনি কিছু বলা চলবে না,' বিড়বিড় করল শহীদ।

তিন

রুস্তম বেপারির বড় বউ টেপির মা পাড়া বেড়াতে গেছে। গাঁজার কল্কেতে কষে কয়েকটা টান দিয়ে তৃতীয় বউকে নিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করেছে বেপারি। সেজন্যে ছোট বউ শোভা খুব রেগে আছে।

কাল রাতে বেপারির হাতে পঞ্চাশ টাকার একটা নোট গুঁজে দিয়ে শওকত বলেছিল, ওদের হাঁড়িতে তার জন্যেও যেন তিনবেলা ভাত রান্না করা হয়। বেপারি তখনই উপস্থিত তিন স্ত্রীকে নির্দেশ দেয়, শওকতের ঘরে খাবার দিয়ে আসবে টেপি। টেপি তার একমাত্র সন্তান, সাত-আট বছরের নাবালিকা।

টেপিকে আশপাশে কোথাও দেখতে না পেয়ে খুশি হলো শোভা। বাসনে ভাত-তরকারি বেড়ে নিজেই চলে এল শওকতের ঘরে। ছেলেটা দেখতে সুন্দর, বয়েসও বেশি নয়, কাল রাতে দেখামাত্র শোভার মনটা নেচে উঠেছিল।

'আরে শোভা ভাবী, তুমি! টেপিকে পাঠালেই তো হত।' শুয়ে ছিল শওকত, তাড়াতাড়ি উঠে বসল।

'ভাবী হুনতে আমার বালা লাগে না, তুমি আমারে শোভা কইলেই চলব,' চৌকির ওপর গ্লাস আর বাসন নামিয়ে রেখে

শওকতের পাশেই বসে পড়ল শোভা। 'টেপিরে খেদায় দিছি, তোমার লগে দুইটা সুখ-দুঃখের কতা কইতে মন চাইল, তাই।'

শওকতের চেহারায় হঠাৎ সতর্ক একটা ভাব এসে গেল। 'আমি নিজের চিন্তায় পাগল হয়ে আছি, কারও সুখ-দুঃখের কথা শোনার সময় হবে না।'

'তুমিও দেখতাছি অগো লাহান, মনে দয়া-রহম কিছুই নাই,' কৃত্রিম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল শোভা। 'নাও, তাড়াতাড়ি খায়া বাসনটা খালি করো।'

সাভার সদরে ছিনতাই ও চাঁদাবাজি করতে গিয়ে পুলিসের ধাওয়া খেয়ে গ্রামে পালিয়ে যায় শওকত। যৌতুক পাবার লোভে একটা মেয়েকে বিয়ে করে। শ্বশুর দেই-দিচ্ছি করে সব টাকা শোধ করতে পারেনি। বউকে মারধর করে শ্বশুর বাড়ি নিয়ে যায় সে, সেখান থেকে শালার সাইকেলটা চুরি করে পালিয়ে আসে সদরে, সেটা বিক্রি করে দেড় হাজার টাকা পায়। তারপর বাস ধরে ঢাকায় চলে আসে। সাভারে থাকতেই খবর পেয়েছিল, ঢাকা শহরের অন্ধকার গলিতে ছিনতাই করা কোন সমস্যাই নয়। এ-ও শুনেছিল বেশিরভাগ ছিনতাইকারী কল্যাণপুর বস্তিতে থাকে—গাবতলী বাস টার্মিনাল কাছে বলে। টার্মিনালে ছিনতাই করাই সবচেয়ে সহজ, তার ওপর ফেন্সি বিক্রির কাজও পাওয়া যায়।

নিজেকে খুব চালাক বলে মনে করে শওকত। সে জানে, চোখ-কান খোলা রাখতে পারলে বড় কোন দাও মারার সুযোগ ঠিকই একটা পেয়ে যাবে। গেছেও তাই। কাল রাতে বস্তিতে আসার পথে যাদেরকে সে দেখেছে, শ্যামলির খুনের সঙ্গে তারা জড়িত না-ও হতে পারে। তবে লোকটার আচরণ দেখে তার মনে

হয়েছে, মেয়েটার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক না থেকেই পারে না। ভয়ে একেবারে কুঁকড়ে ছিল লোকটা। এখন তাকে জানতে হবে, মেয়েটা আর লোকটার পরিচয় কি, কি করে, টাকা-পয়সা কি রকম আছে।

শোভাকে সে জিজ্ঞেস করল, 'লাশটা যেখানে পাওয়া গেছে, ওখান থেকে খানিক দূরে একটা বাড়ি আছে। ওটা কার বাড়ি জানো তুমি?'

'ওইডা তো আমাগো তমা আপার বাড়ি,' বলল শোভা। ঢাহা শহরে হেগো আরও অনেক বাড়ি আছে। তমা আপার বাপে খুব বড় মানুষ, ঢাহা শহরের সবতে তাঁরে চিনে। বাপের লগে রাগ কইরা তমা আপা এহানে একা পইড়া আছেন। আপায় খুব বালা মাইয়া। তোমার বাই রুস্তম বেপারির কাছ থনই আপায় গাঁজা আর ফেন্সি কিনেন। দুই ঈদে আপায় শাড়ি-ব্লাউজ বিলান।'

'বাপ যদি এতই বড় লোক হবে, মেয়েকে একা থাকতে দেয় কেন?'

'মাইয়াডা আসলে ফুর্তিবাজ,' মুখে হাতচাপা দিয়ে বলল শোভা। 'বাপেরে বুজাইছেন উনি একডা এনজিও চালান, তাই বস্তির কাছাকাছি না থাকলে তাঁর চলব না। বাপেও মাইয়ার কতা বিশ্বাস করছেন। বড় মাইনষের ব্যাপারস্যাপারই আলাদা, এ-সব তুমি বুঝবা না বাই।'

খেতে বসে একের পর এক প্রশ্ন করে গেল শওকত। নতুন বীমা অফিস সম্পর্কে জানতে পারল সে। জানতে পারল অফিসের ম্যানেজার হায়দার আলি সম্পর্কেও। হায়দার যে বিবাহিত, তার ডাক্তার স্ত্রী শাহানা একটা ক্লিনিকে চাকরি করে, তমার মাধ্যমে এ-খবরও শোভার জানা দেখে বিস্মিত হলো সে। তবে বিস্ময়ের চেয়ে

খুশির মাত্রাটা বেশি।

খাওয়া শেষ হতে শোভাকে প্রশ্রয় দেয়ার মত দু'একটা কথা বলে আপাতত বিদায় করে দিল শওকত, তারপর ব্যাগ থেকে নতুন শার্ট-প্যান্ট পরে বেরিয়ে পড়ল 'উদ্ধার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি'-র নতুন শাখা অফিসের খোঁজে।

অফিসটার সামনে এসে কাচের দরজা দিয়ে ভেতরে তাকাতেই তসলিমা আর হায়দারকে চিনতে পারল সে, এদেরকেই কাল রাতে কল্যাণপুর বস্তির কাছাকাছি দেখেছে।

কয়েকজন ক্লায়েন্টের সঙ্গে কথা বলছে তমা ওরফে তসলিমা, হঠাৎ বাইরে তাকাতে শওকতকে দেখে ফেলল। সে-ও দেখামাত্র চিনে ফেলল তাকে—কাল রাতে এই লোকটাই জিজ্ঞেস করেছিল কল্যাণপুরের বস্তিটা কোনদিকে।

ঠোঁট কামড়ে চিন্তা করছে তসলিমা।

ওদের ইউনিভার্সেল সার্ভিসেস-এর হেড অফিসটা মগবাজারে। কামালকে নিয়ে শহীদ অফিসে পৌঁছে দেখল কয়েকটা জাতীয় দৈনিকের ক্রাইম রিপোর্টার ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে। তদন্তের এই পর্যায়ে রিপোর্টারদের কোন তথ্য দিতে রাজি নয় শহীদ, চা-পানি খাইয়ে পরে যোগাযোগ করার অনুরোধ করল ও। রিপোর্টাররা চলে যেতে নিজেও বেরিয়ে পড়ল, খোঁজ নিয়ে দেখবে কুয়াশার পাঠানো তামার বোতামটা কোন রেডিমেড গার্মেন্ট-এর দোকান বা টেইলারিং শপের মালিক চিনতে পারে কিনা।

পশ্ এলাকার কয়েকটা দোকানে বোতামটা দেখাল শহীদ। আনকমন বোতাম, সবাই মাথা নেড়ে জানাল আগে কখনও এই বোতাম দেখেনি তারা। এলিফেন্ট রোড, গাউসিয়া, নিউ মার্কেট

হয়ে বঙ্গবাজারে চলে এল ও। পাঁচ-সাতটা দোকান থেকে ব্যর্থ হয়ে বেরিয়ে আসার পর ছোট একটা দোকানে ঢুকল, আনন্দে চকচক করছে চোখ দুটো। দোকানটা ছোট, মালিক আরও ছোট–টেনেটুনে সাড়ে চারফুট হতে পারে। তবে শহীদের খুশি হবার কারণ সেটা নয়। বাইরে থেকেই কয়েকটা নীল রঙের জ্যাকেট দেখতে পেয়েছে সে, প্রতিটি জ্যাকেটে তামার বোতাম লাগানো রয়েছে–হুবহু কুয়াশার পাঠানো বোতামটার মতই।

দোকানদার সালাম দিলেন। জবাব দিয়ে পকেট থেকে বোতামটা বের করল শহীদ। 'এটা ভাল করে দেখুন তো, চিনতে পারেন?'

দোকানদার মাথা ঝাঁকাল। ভদ্রলোকের নাম আবদুস শাকুর। শহীদ নিজের পরিচয় দিতে খাতির করে বসতে দিলেন। জানালেন, ব্যবসার কাজে সিঙ্গাপুরে গিয়ে বোতামগুলো দেখতে পান তিনি, পছন্দ হয়ে যাওয়ায় কয়েক বাক্স কিনে এনেছেন। কেনার পর ওখানকারই এক কারিগরকে দিয়ে বোতামগুলোর গায়ে নিজের নাম 'শাকুর' খোদাই করান–খুব মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা না করলে নামটা পড়া যাবে না। তার দোকানের নামও শাকুর অ্যান্ড সন্স।

শহীদ জানতে চাইল, 'এই বোতাম লাগানো জ্যাকেট কতদিন থেকে বিক্রি করছেন আপনি? কারা আপনার এই জ্যাকেট কিনেছে বলতে পারবেন?'

'জ্যাকেটগুলো মাত্র তিন মাস হলো বানানো হয়েছে, ক্যাশমেমো দেখে বলতে পারব কে কে কিনেছেন।' ঘাঁটাঘাঁটি করে পুরানো ক্যাশমেমো বের করলেন তিনি। দেখা গেল, গত তিন মাসে বারোটা জ্যাকেট বিক্রি হয়েছে দোকান থেকে। আটটা

কিনেছে বিভিন্ন দূতাবাসের বিদেশী লোকজন। চারটে কিনেছে দেশী ক্রেতারা। সব ক্রেতারই নাম-ঠিকানা একটা কাগজে লিখে শহীদের দিকে বাড়িয়ে ধরলেন দোকানি। তালিকাটার ওপর চোখ বুলাচ্ছে শহীদ, হঠাৎ শিস দিয়ে উঠল। দোকানি হাঁ করে তাকিয়ে আছে দেখে হাসল ও, বলল, 'আপনি একটা মার্ডার কেসে পুলিসকে সাহায্য করছেন, শাকুর সাহেব। এই ভিজিটিং কার্ডটা রাখুন, যে-কোন সমস্যায় যোগাযোগ করলে আমার সাহায্য পাবেন।' ইউনিভার্সেল সার্ভিসেস-এর একটা কার্ড কাউন্টারে রাখল ও। শাকুর সাহেবও নিজের একটা কার্ড দিলেন ওকে। দ্রুত গাড়ি চালিয়ে হেড অফিসে ফিরে এল শহীদ।

জ্যাকেট ক্রেতাদের মধ্যে হায়দার আলিও একজন, শুনে উত্তেজিত হয়ে উঠল কামাল। 'তাহলে তো একটা ব্যাপার নিশ্চিত, লাশ যেখানে পাওয়া গেছে সেখানে এই হায়দার আলি ছিল!'

শহীদ বলল, 'আগে দেখতে হবে হায়দার আলির জ্যাকেটে একটা বোতাম কম আছে কিনা। আমি খোঁজ নিয়েছি, সে বিবাহিত, স্বাভাবিক ভদ্র জীবন যাপন করে। এ-ধরনের লোক খুনী হতে পারে না।'

'কিন্তু তুই আমাকে বলেছিস, তসলিমা সত্যি কথা বলছে না,' প্রতিবাদ করল কামাল। 'খুনের রাতে বাড়িতে সে একা ছিল, এটা তুই বিশ্বাস করিসনি।'

'না, করিনি,' বলল শহীদ। 'তসলিমার সঙ্গে তখন হয়তো হায়দার আলি ছিল, তার সুনাম রক্ষার জন্যেই মিথ্যে কথা বলছে।'

'বাকি এগারোজন সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছিস, আর যারা জ্যাকেটগুলো কিনেছে?' জানতে চাইল কামাল।

'বিদেশী আটজন ক্রেতাকে সন্দেহের তালিকা থেকে আপাতত বাদ রাখব আমরা,' বলল শহীদ। 'বাকি থাকে তিনজন। একজন সংস্থাপন বিভাগের উপ-সচিব, তাঁকেও তালিকা থেকে বাদ দিতে পারি। একজন নামকরা ফুটবল খেলোয়াড়, মোশাররফ। চেক করে দেখতে হবে কাল সন্ধ্যার পর কোথায় ছিল সে–তবে তাকে আমি চিনি, অত্যন্ত শান্তশিষ্ট ছেলে। বাকি থাকল আর একজন। ভদ্রলোকের নাম শফিকুর রহমান।' ভুরু কোঁচকাল শহীদ, তারপর আপনমনে মাথা নাড়ল। 'পাঁচ-ছয় মাস আগে রোড অ্যাক্সিডেন্টে ভদ্রলোক না মারা গেছেন? রিয়েল এস্টেটের ব্যবসা করতেন, প্রচুর টাকা কামিয়েছিলেন। তাঁকেও তো তালিকায় রাখা যাচ্ছে না।' টেবিলে আঙুল নাচাল ও। 'কি আশ্চর্য, তালিকায় শুধু হায়দার আলিকেই রাখতে হচ্ছে দেখছি!'

'চল তাহলে এখুনি তাকে ধরি,' চেয়ার ছেড়ে উঠতে গেল কামাল।

হাত তুলে তাকে থামাল শহীদ। 'শফিকুর রহমান সম্পর্কে অন্তত এটুকু আমার জানা আছে, ভদ্রলোক অত্যন্ত সৌখিন ছিলেন। প্রতি মাসে গাদাগাদা কাপড়চোপড় কিনতেন। তিনি মারা যাবার পর অত কাপড়চোপড় কি করেছেন তাঁর স্ত্রী?'

'ভাল একটা প্রশ্ন,' মন্তব্য করল কামাল। 'তুই শাকুর অ্যান্ড সন্সে ফোন করে জেনে নে শফিকুর রহমান জ্যাকেটটা কবে কিনেছিলেন।'

শাকুর সাহেব ম্লান কণ্ঠে জানালেন, শফিকুর রহমান মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় যেদিন মারা যান তার ঠিক আগের দিন জ্যাকেটটা কিনেছিলেন। দুর্ঘটনার সময় ওই জ্যাকেট তাঁর গায়ে ছিল। শহীদের প্রশ্নের উত্তরে বললেন, না, শফিকুর রহমান মারা যাবার

পর তার কাপড়চোপড় নিয়ে কি করা হয়েছে তা তিনি জানেন না। এরপর শহীদ কোন প্রশ্ন না করা সত্ত্বেও অনেক কথা বলে গেলেন তিনি। শফিকুর রহমান তাঁর দোকান থেকে নিয়মিত কেনাকাটা করতেন, সেই সূত্রে ভদ্রলোকের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক অনেক ঘটনার কথা তিনি জানেন। এই যেমন, বিবাহিত জীবনে শফিকুর রহমান সুখী ছিলেন না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য শুরু হয় একমাত্র সন্তানকে নিয়ে। তাঁর স্ত্রী নাফিসা বেগমের কাছে স্বামীর চেয়ে বেশি গুরুত্ব পেত সন্তান। অনেক পরিবারেই এটা ঘটতে দেখা যায়। তবে এঁদের ব্যাপারটা সিরিয়াস হয়ে ওঠে। আসলে শফিকুর রহমান খুব ভাল মানুষ ছিলেন, স্ত্রীকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি। সন্তান জন্মাবার পর নাফিসা বেগম তাঁর সমস্ত স্নেহ-ভালবাসা তাকেই ঢেলে দেন, স্বামীর জন্যে কিছুই অবশিষ্ট রাখেননি। বন্ধু-বান্ধবরা শফিকুর রহমানকে দ্বিতীয় বিয়ে করার পরামর্শ দিয়েছিল, কিন্তু তা তিনি করেননি। ভদ্রলোক জীবনের শেষদিক খুব ভুগেছেন, দুঃখ করে বললেন শাকুর সাহেব।

শহীদ জানতে চাইল, ভদ্রলোকের ছেলে কি করে? শাকুর সাহেব জানালেন, তা তিনি জানেন না। ছেলেটাকে কখনও তিনি দেখেনওনি। তবে ওদের বাড়িটা তিনি চেনেন। তার কাছ থেকে নাফিসা বেগমের সামাজিক মর্যাদা সম্পর্কে একটা ধারণাও পাওয়া গেল। ভদ্রমহিলা সমাজসেবিকা, সমাজের উঁচুস্তরে মেলামেশা করেন, মন্ত্রী-মিনিস্টাররা তাঁর বন্ধু-বান্ধব।

কথাটা দুপুর থেকে চেপে রেখেছিল তসলিমা। আজ তার এক বান্ধবীর জন্মদিন, তাই চারটে পর্যন্ত কাজ করল সে। অফিস থেকে বেরিয়ে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে, এই সময় হালকা সুরে কথাটা

বলল।

শুনে বুকটা ধড়াস করে উঠল হায়দারের। 'সেইই? ঠিক চিনতে পেরেছ?'

'ওই চুল একবার দেখলে কেউ ভোলে? অফিসের বাইরে থেকে সরাসরি আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। চোখাচোখি হতে বুঝলাম, আমাকেও সে চিনতে পেরেছে। চেনার জন্যেই এসেছিল। নিশ্চয় তোমাকেও চিনেছে।'

আতঙ্কে নিঃশ্বাস ফেলতে ভুলে গেল হায়দার। 'এখন কি হবে?'

'কি আবার হবে! আমার মনে হয় না পুলিসের কাছে যাবে সে।'

'নিশ্চয় কোন কুবুদ্ধি আঁটছে, তা না হলে এখানে আসবে কেন?'

রাগের সঙ্গে কিছু বলতে যাচ্ছিল তসলিমা, এই সময় সুইংডোর ঠেলে ওয়েটিং রুমে ঢুকল শওকত। দারোয়ান আর পিয়ন মুখ তুলে তাকাল, কিছু বোধহয় জিজ্ঞেস করল, কিন্তু তাদেরকে গ্রাহ্য না করে সরাসরি দ্বিতীয় কামরায় ঢুকে পড়ল সে।

চেয়ারে স্থির হয়ে বসে আছে হায়দার। শওকত দেখতে পেল না, ওর হাত দুটো নড়ছে। টেবিলের দেরাজ খুলে টেপ রেকর্ডারের সুইচটা অন করল।

তসলিমা বলল, 'আজকের মত বন্ধ হয়ে গেছে অফিস। বীমা সম্পর্কে আলাপ করতে চাইলে আপনাকে কাল আসতে হবে।'

'ভান করে কোন লাভ নেই।' নিষ্ঠুর এক চিলতে হাসি লেগে রয়েছে শওকতের ঠোঁটে। 'কাল রাতে আপনার বাড়ির কাছে একটা মেয়ে খুন হয়েছে। উনি, হায়দার সাহেব, ওই সময়

আপনার বাড়িতে ছিলেন। আপনাদের দু'জন সম্পর্কে সমস্ত খবর জেনেছি আমি। ভয় পাবেন না, আমি পুলিসের কাছে যাচ্ছি না। পুলিসের কাছে যাচ্ছি না, নেসার আহমেদকে কিছু বলছি না, মিসেস শাহানা হায়দারকেও কিছু বলছি না।'

'এখানে কেন...কি চান আপনি?'

'ওই যে বললাম, পুলিসের কাছে যাচ্ছি না আমি।' হাসল শওকত। 'আপনাদের এই উপকারের বিনিময়ে আপনারাও আমার খানিক উপকার করবেন।'

'কি উপকার?'

'দু'লাখ টাকা দিয়ে আমাকে সাহায্য করুন!'

মাথাটা ঘুরে উঠল হায়দারের। ব্ল্যাকমেইল করতে এসেছে!

'টাকা? দু'লাখ টাকা?' তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল তসলিমা। 'জানো, কার সঙ্গে কথা বলছ তুমি? এলাকার সমস্ত টপ টেরর আমাকে চেনে। তাদেরকে বলে এমন ধোলাই দেওয়াব...'

'তিন দিন পর আসব আমি,' বলল শওকত, আক্রোশে কুৎসিত দেখাল চেহারাটা। 'টাকা দিলে ভাল, তা না হলে আপনার বাবা আর হায়দার সাহেবের স্ত্রীকে সব কথা বলে দেব আমি। পুলিসকেও...'

'গেট আউট!' অকস্মাৎ চিৎকার করে উঠল তসলিমা। 'পুলিসের ভয় দেখাও, এত বড় সাহস! জানো, ব্ল্যাকমেইল করার অভিযোগে আমরাই তোমাকে অ্যারেস্ট করাতে পারি?'

হাসতে হাসতে অফিস কামরা থেকে বেরিয়ে গেল শওকত, তসলিমার হুমকি তাকে স্পর্শই করেনি।

'তোমার বুদ্ধির প্রশংসা করি,' নিজেকে সামলে নিয়ে বলল তসলিমা। 'ওর সব কথা রেকর্ড হয়েছে তো?'

'হ্যাঁ।' টেপটা বন্ধ করে বলল হায়দার।

'গুড। টেপটা আমাকে দাও, ওটা নিয়ে আমি থানায় যাব,' বলল তসলিমা।

'তোমার কি মাথা খারাপ হলো!' তসলিমার বোকামি দেখে হায়দার খুব অবাক হলো। 'পুলিস ওর বিরুদ্ধে ব্ল্যাকমেইলের অভিযোগ আনবে, তখন মুখ খুলতে বাধ্য হবে সে। আমাদের অসামাজিক আচরণ কারও আর জানতে বাকি থাকবে না!'

মাথাটা একদিকে কাত করে হায়দারের দিকে তাকিয়ে থাকল তসলিমা। 'তুমি বলতে চাইছ ওই শুয়োরটাকে আমরা দু'লাখ টাকা দেব?'

'টাকা দেব? অত টাকা আমি পাব কোথায়!'

'আমিই বা কোথায় পাব! কাজেই, টাকা আমরা দিচ্ছি না। আমি বাপ্পিকে বলি, অফিসের কাজে তোমাকে বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলাম। বাপ্পি তো বাড়িটা তোমাকে চিনিয়ে দিতে বলেইছিল। তুমিও শাহনাকে কথাটা জানাও, আমার বাড়িতে একটা কাজে যেতে হয়েছিল তোমাকে। এখন সময় নেই, কাল কথা হবে,' বলে অফিস থেকে বেরিয়ে গেল তসলিমা।

শাহানাকে জানাব! হায়দার ভাবছে। এর অর্থ শাহানাকে মিথ্যে কথা বলতে হবে। মাথার চুলে আঙুল চালাবার সময় নিজেকে কষে চড় মারতে ইচ্ছে হলো তার। ছেলেটা নিশ্চয়ই তাদের বাড়ির ঠিকানাও যোগাড় করে ফেলেছে–শাহানাকে সে ফোন করতে পারে, কিংবা হয়তো চিঠি লিখে সব কথা জানাবে। ওহ্, খোদা! শাহানাকে কিভাবে বোঝাবে সে? সে তো মিথ্যে কথা বলতে পারে না! বলতে গেলেই ধরা পড়ে যায়।

বাড়িতে ফেরার পথে হায়দার কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারল

না। শাহানাই দরজা খুলল। তার চেহারা কাঁদো কাঁদো হয়ে আছে দেখে বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল হায়দারের। 'ভালই হয়েছে তুমি তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছ,' বলল শাহানা। 'সুটকেস গুছিয়ে তৈরি হয়েই আছি আমি, রাতের বাসেই যাব।'

'কেন, কি হয়েছে? কোথায় যাবে?' হায়দার হতভম্ব।

'খানিক আগে আম্মু ফোন করেছিলেন,' বলল শাহানা। 'আব্বুর হার্ট অ্যাটাক করেছে, আমাকে দেখতে চাইছেন।'

'বলো কি! কিন্তু তোমাকে আমি একা ছাড়ি কিভাবে, এদিকে অফিসে...'

'একা তো আগেও আমি আসা-যাওয়া করেছি। না, নতুন অফিস, তোমার ছুটি নেয়া চলে না। তুমি শুধু আমাকে বাসে তুলে দিয়ে আসবে চলো। এক ঘণ্টার মধ্যে রওনা হতে পারলে ভোরে পৌঁছে যাব বাড়িতে।' শাহানার বাপের বাড়ি খুলনায়।

স্ত্রীকে বাসে তুলে দিতে যাচ্ছে হায়দার। মনে মনে খানিকটা স্বস্তিবোধ করছে সে। শাহানা যদি হপ্তাখানেক খুলনায় থাকে, ব্ল্যাকমেইলার ছেলেটা ফোন করে বাড়িতে কাউকে পাবে না।

'ফুটবলার মোশাররফ সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ পড়ল,' কামালকে বলল শহীদ। 'কাল বিকেল থেকে অনেক রাত পর্যন্ত নিজেদের ক্লাবে বসে তাস পিটিয়েছে সে। আমি তার জ্যাকেটটাও দেখেছি, কোন বোতাম হারায়নি। দূতাবাসের আটজনের মধ্যে চারজন বাংলাদেশ ছেড়ে চলে গেছে, জ্যাকেটগুলো রেখে যায়নি। বাকি চারজনের জ্যাকেট চেক করেছি, বোতাম ঠিক আছে। বাকি থাকল শুধু হায়দার আলি আর শফিকুর রহমান।'

'তাহলে ধরে নিতে হয় সন্ধের পর নেসার আহমেদের

মেয়েটার সঙ্গে হায়দার আলি ছিল,' বলল কামাল। 'তারমানে ওদের মধ্যে একটা অবৈধ সম্পর্ক থাকতে পারে। তসলিমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফেরার সময় হায়দার আলি লাশটা নিশ্চয়ই দেখেছে, কি বলিস? এমন কি খুনীকেও দেখে থাকতে পারে, তাই না?'

'প্রথম কাজ তার জ্যাকেটটা পরীক্ষা করা,' বলল শহীদ। 'শুধু হায়দারের জ্যাকেট নয়, শফিকুর রহমানের জ্যাকেটটাও দেখতে হবে। চল, বেরিয়ে পড়া যাক।'

শাহানাকে বাসে তুলে দিয়ে এইমাত্র ফিরেছে হায়দার। হঠাৎ কলিংবেল বেজে উঠল। ফ্ল্যাটের দরজা খুলে শহীদ আর কামালকে দেখে ভড়কে গেল সে। হাঁ করে তাকিয়ে থাকল, কথা বলতে পারছে না।

'আমরা আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই,' বলল শহীদ। 'বসতে বলবেন না?'

'হ্যাঁ, প্লীজ,' বলে দরজা ছেড়ে সরে এল হায়দার।

ড্রইংরুমে বসার পর শহীদ বলল, 'আপনি তো জানেনই, আমরা একটা মার্ডার কেস তদন্ত করছি।' হাতের মুঠো খুলে বোতামটা দেখাল। 'এটা আপনার কিনা বলতে পারেন?'

'আ-আমার মনে হয় না!' পা কাঁপলেও নড়ার শক্তি নেই যে বসে হায়দার।

'এটা লাশের কাছাকাছি পাওয়া গেছে,' বলল শহীদ। 'আনকমন বোতাম, তাই আমরা চেক করে দেখেছি। শাকুর অ্যান্ড সন্স থেকে মাত্র কয়েকজন নীল রঙের জ্যাকেট কেনে, ওই জ্যাকেটগুলোতেই শুধু এই বোতাম লাগানো হয়। ক্রেতাদের মধ্যে

আপনিও একজন। তাই আপনার জ্যাকেটটা আমরা দেখতে এলাম। সেটা বাড়িতে আছে তো?'

নিচের ঠোঁটটা চুষল একবার হায়দার। 'আছে।'

'আমরা একবার দেখতে পারি?'

ওহ্ খোদা! ভাবছে হায়দার, যদি একটা বোতাম না থাকে! 'আনছি।'

হায়দার কামরা থেকে বেরিয়ে যেতেই শহীদের কানে ফিসফিস করল কামাল, 'আমরা ঠিক জায়গাতেই এসেছি।'

বেডরূমে ঢুকে আলমারি খুলে জ্যাকেটটা বের করল হায়দার। পরীক্ষা করতে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল তার। জ্যাকেটে সবগুলো বোতামই আছে। ড্রইংরূমে ফিরে শহীদের হাতে জ্যাকেটটা ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'কোন বোতাম হারায়নি।'

কামালের চেহারা ম্লান হয়ে গেল। জ্যাকেটটা দেখে ফেরত দিল শহীদ, সোফা ছেড়ে বলল, 'কষ্ট দেয়ার জন্যে দুঃখিত, মি. হায়দার।'

হাসি হাসি মুখ করে হায়দার বলল, 'আমি কিছু মনে করিনি।'

'মেয়েটা খুন হয় কাল রাত আটটার দিকে, ছ'টা থেকে ন'টা পর্যন্ত কোথায় ছিলেন আপনি?' জানতে চাইল শহীদ।

আবার আতঙ্ক বোধ করল হায়দার। 'কেন, বাড়িতে ছিলাম। শ্যালিকার বিবাহবার্ষিকীতে যাবার কথা ছিল, কিন্তু গাড়িটা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় যেতে পারিনি, ভায়রাকে ফোন করে ক্ষমা চেয়ে নিই।'

'ভায়রাকে আপনি কখন ফোন করেছিলেন, মি. হায়দার?'

'এই আটটার দিকে। ঘড়ি দেখিনি, সাড়ে আটটাও হতে পারে।'

'আপনার ভায়রার পরিচয়টা জানতে পারি?'

'সালাম শিকদার, ব্যারিস্টার।'

'ও, আচ্ছা। ভদ্রলোককে আমি চিনি। আপনি তাহলে সন্ধের পর থেকে বাড়িতেই ছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

গাড়িতে ফিরে এসে কামাল বলল, 'লোকটা মিথ্যে কথা বলছে।'

'বিবাহিত হলে তুইও বলতি,' জবাব দিল শহীদ। 'চল এবার শফিকুর রহমানের স্ত্রী নাফিসা বেগমের সঙ্গে কথা বলে আসি।'

নাফিসা বেগমের বাড়িটা বনানীতে, পৌঁছুতে রাত আটটা বেজে গেল। লোহার গেটে কোন দারোয়ান নেই, বাইরে থেকে সেটা খোলাও যায়। বাড়িটা একতলা ছিল, পরে দোতলা করা হয়েছে। একতলাটা পুরানো, দেয়াল থেকে বেশিরভাগ প্লাস্টার খসে পড়েছে। সদর দরজায় থেমে কলিংবেল বাজাল ওরা।

অপেক্ষা করছে, বাড়ির দু'পাশে তাকাল শহীদ। ডান দিকে বাগান, আরও সামনে একটা সুইমিং পুল। ডান দিকে পাশাপাশি চারটে গ্যারেজ।

দরজা খুলে গেল, সামনে আবির্ভূত হলো যেন হরর ফিল্মের কোন ভিলেন। লোকটা অসম্ভব লম্বা, তাই কুঁজো হয়ে আছে। বয়েস সত্তরের কম হবে না, সারা মুখে অসংখ্য ভাঁজ আর রেখা, পরে আছে সাদা ধবধবে উর্দি। ঘুম ঘুম চোখে ওদেরকে দেখল সে, কর্কশ গলায় জানতে চাইল, 'কি চাই?' মাথার সাদা চুল বাতাসে উড়ছে।

'মিসেস রহমানকে চাই,' বলল শহীদ। 'আমরা প্রাইভেট ডিটেকটিভ।'

'বেগমসাহেবা বিছানায় উঠেছেন, এখন কারও সঙ্গে দেখা করবেন না,' বলল লোকটা। 'আমি খয়েরউদ্দিন, স্যার। বেগমসাহেবার খাস চাকর। আমার ওপর হুকুম আছে, সন্ধের পর বেগমসাহেবাকে বিরক্ত করা যাবে না। আপনারা কাল আসুন।'

'আমরা একটা মার্ডার কেস তদন্ত করছি,' বলল শহীদ। খয়েরউদ্দিনকে দেখাল বোতামটা। 'এটা চিনতে পারো?'

বোতামটা হাতে নিয়ে খুঁটিয়ে দেখল খয়েরউদ্দিন, চেহারায় কোন ভাব প্রকাশ পেল না। 'এরকম বোতাম দেখেছি, স্যার। আমার বড় সাহেব একটা জ্যাকেট কিনেছিলেন, তাতে ছিল। কিন্তু তিনি তো ছ'মাস আগে মারা গেছেন।'

'জ্যাকেটটা কোথায়?'

'বড় সাহেবের সমস্ত কাপড়চোপড় আজিমপুর এতিমখানায় দান করে দেয়া হয়েছে, স্যার।'

'জ্যাকেটটাও?'

চোখ মিটমিট করল খয়েরউদ্দিন। 'জ্বী, জ্যাকেটটাও।'

আঙুল দিয়ে নাকের পাশটা ঘষল শহীদ, সন্দেহ হচ্ছে লোকটা সত্যি কথা বলছে না। 'কবে?'

'বড় সাহেব মারা যাবার দু'হপ্তা পর।'

'এতিমখানায় দান করার সময় লক্ষ করেছিলে, জ্যাকেটে সবগুলো বোতাম লাগানো ছিল কিনা?'

আবার চোখ মিটমিট করল খয়েরউদ্দিন। 'না, খেয়াল করিনি।'

'বোতামটা পাওয়া গেছে লাশের কাছাকাছি,' বলল শহীদ। 'মনে পড়ে কিনা চিন্তা করো–এতিমখানায় পাঠাবার সময়

জ্যাকেটে সবগুলো বোতাম ছিল?'

'না থাকলে অবশ্যই চোখে ধরা পড়ত, স্যার। তবে জ্যাকেটটা আমি ভালভাবে পরীক্ষা করিনি।'

'ঠিক আছে, প্রয়োজন হলে পরে আমরা মিসেস রহমানের সঙ্গে কথা বলতে আসব।'

গাড়িতে ফিরে এসে কামালকে বলল শহীদ, 'কাল সকালে তুই এতিমখানায় খবর নিবি। দামী জ্যাকেট, ওঁদের দান যারা গ্রহণ করেছে তাদের মনে থাকার কথা।'

'আমার মাথায় একটা আইডিয়া খেলছে,' হঠাৎ বলল কামাল। 'দামী জ্যাকেট, বোতামগুলো স্পেশাল, শাকুর সাহেবের মত সিরিয়াস একজন ব্যবসায়ী খদ্দেরকে অতিরিক্ত এক সেট বোতাম দিয়ে থাকতে পারেন। চেক করে দেখব নাকি?'

'আর কোন চিন্তা নেই,' হেসে উঠে বলল শহীদ। 'তোর বুদ্ধি খুলছে।'

গাড়িতে বসেই মোবাইল ফোনে শাকুর সাহেবের সঙ্গে তিন মিনিট কথা বলল কামাল। তারপর শহীদকে জানাল, 'প্রতিটি জ্যাকেটের সঙ্গে দুটো করে বোতাম অতিরিক্ত সরবরাহ করা হয়েছে! মাই গড, শহীদ, কেসটা দারুণ ইন্টারেস্টিং হয়ে উঠছে!'

'তাহলে তো হায়দার আলির কাছে ডুপ্লিকেট বোতাম দুটো আছে কিনা চেক করে দেখতে হয়,' গম্ভীর সুরে বলল শহীদ।

চার

ড্রইংরুমেই ছিলেন নাফিসা বেগম, দরজার আড়ালে লুকিয়ে থেকে সব কথাই কান পেতে শুনলেন।

ভদ্রমহিলার বয়েস হলেও এখনও শক্ত-সমর্থ। সব সময় মেকআপ নিয়ে থাকেন তিনি, মাথার সাদা চুল কলপ দিয়ে কালো করা। চোখ দুটো বড় বড়, নাকটা একটু ছোট, মোটা ঠোঁটে জেদ আর নিষ্ঠুরতার আভাস।

প্রাইভেট ডিটেকটিভ শহীদ খানের মুখে তামার বোতাম লাগানো জ্যাকেটটার কথা শুনে শিউরে উঠলেন তিনি। দ্বিতীয়বার শিউরে উঠলেন খয়েরউদ্দিন যখন বলল, সমস্ত কাপড়চোপড়ের সঙ্গে জ্যাকেটটাও এতিমখানায় পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এই মুহূর্তে রক্তমাখা জ্যাকেটটা একতলার স্টোর রুমে রয়েছে, তাঁর ছেলের রক্তমাখা ট্রাউজার আর জুতোর সঙ্গে।

দরজার আড়াল থেকে সরে এসে জানালার পাশে চলে এলেন, টয়োটা নিয়ে প্রাইভেট ডিটেকটিভদের চলে যেতে দেখছেন। ভয়ে বুকটা ধড়ফড় করছে তাঁর। শহীদ খান সম্পর্কে শুনেছেন তিনি। শখের এই গোয়েন্দা সাধারণত কোন কেসে ব্যর্থ হয় না। জানালার পাশ থেকে সরে এসে একটা সোফায় ভারী শরীরটা

ছেড়ে দিলেন। মুখ ঢাকলেন দু'হাতে।

রোড অ্যাক্সিডেন্টে স্বামী মারা যাবার পর তাঁর জীবন নরক হয়ে উঠেছে। 'মারা যাবার পর খোলা যাবে,' এই শিরোনামে একটা চিঠি লিখে রেখে যান তিনি। পারিবারিক অ্যাটর্নি চিঠিটা তাঁকে দিয়ে যান। খুলে দেখেন, স্বামী তাঁকে সম্বোধন করেই লিখে গেছেন চিঠিটা। সেটা বেশ কয়েকবার পড়েছেন নাফিসা বেগম, প্রায় মুখস্থই হয়ে গেছে।

'নাফিসা,

জীবনে তুমি দুটো জিনিস চিনেছ। একটা হলো, ছেলেকে পুরোপুরি নিজের দখলে আনা। আর দ্বিতীয়টা হলো, টাকা। নজিবুর জন্ম নেয়ার পর আমাকে তুমি শুধু একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হিসেবে দেখেছ। আমি জানি, আমাদের ছেলেটা তোমার স্বভাব পেয়েছে–ক্ষমতা আর টাকার প্রতি তারও প্রচণ্ড লোভ। সেজন্যেই দীর্ঘদিন ধরে নিজের সমস্ত ব্যবসা ধীরে ধীরে তার নামে ট্র্যান্সফার করেছি আমি। কাগজ-পত্রে দেখানো হয়েছে আমার নামে যে-ব্যবসাগুলো ছিল সব মার খেয়েছে। নতুন খোলা নজিবুরের প্রতিটি ব্যবসা ভাল আয় করছে। আর কিছু করার দরকার পড়বে না, এইটুকুই যথেষ্ট। ক্ষমতা আর টাকার লোভ নজিবুরকে এমন পাগল করে তুলবে, তোমাকে সে চিনতেই চাইবে না। সে যে তোমার ওপর নির্ভরশীল নয়, এটা তাকে বোঝাবার জন্যেই এই কাজ করে যাচ্ছি আমি। যখন সে স্বাধীনতার স্বাদ পাবে, তখনই বেরিয়ে আসবে তার আসল চেহারা।

এই চিঠি যখন পড়বে তুমি, আমি তখন বেঁচে থাকব না। কিন্তু নজিবুর বেঁচে থাকবে। সাবধানে থেকো, নাফিসা। ওকে নিজের দখলে রাখার কাজে এত ব্যস্ত ছিলে তুমি, বুঝতেই পারোনি যে সে আর দশজনের মত নয়। আমার সারাজীবনের রোজগার তার

হাতে পড়ুক, তখন আসল সত্যটা উপলব্ধি করতে পারবে তুমি। শফিকুর রহমান।'

চিঠিটা প্রথমবার পড়ে খিলখিল করে হেসে উঠেছিলেন নাফিসা। ভেবেছিলেন, বুড়োটার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, তা না হলে এমন প্রলাপ কেউ লিখে রেখে যায়!

স্বাধীনতার স্বাদ পাবে? নজিবুর? কি করে সম্ভব! নজিবুর পুরোপুরি তাঁর ওপর নির্ভর করে, চিরকাল করবেও তাই। ছেলেকে তিনি স্কুলে বা কলেজে পাঠাননি, নামকরা প্রাইভেট শিক্ষকদের দিয়ে বাড়িতে রেখে লেখাপড়া শিখিয়েছেন। বখাটে, ড্রাগ-অ্যাডিক্টেট, বদমেজাজী ছেলেদের সঙ্গে তাঁর ছেলে মেলামেশা করবে, এটা তিনি ভাবতেই পারতেন না।

ছেলেবেলা থেকে তৈলচিত্র আঁকার দিকে ঝোঁক নজিবুরের। ছেলের প্রতিভা আছে, কাজেই তিনি ছবি আঁকতে উৎসাহ দিতে কার্পণ্য করেননি। দোতলায় ছেলেকে একটা বিশাল স্টুডিও বানিয়ে দিয়েছেন। নজিবুরের বেশিরভাগ সময় ওই স্টুডিওতেই কাটে।

ছেলের আঁকা ছবিগুলোর অর্থ তিনি বোঝেন না, প্রশংসাও করতে পারেন না। নজিবুরের আঁকা আকাশ কালো, চাঁদ লাল, সৈকত কমলা। স্বামীর কথা—নজিবুর আর দশজনের মত নয়! অবশ্যই আর দশজনের মত নয়! ছবি তিনি বোঝেন না, তবে ছেলে যে একটা বিরল প্রতিভা সে-ব্যাপারে তাঁর মনে কোন সন্দেহ ছিল না।

স্বামী মারা যাবার দেড়-দু'মাস পর তাঁর মন খুঁত খুঁত করতে শুরু করে। নজিবুর তার সঙ্গে কথা বলা কমিয়ে দিয়েছে, এটাই কারণ। একদিন তিনি স্টুডিওতে এলেন ছেলে কি করছে দেখার

জন্যে। এসে দেখেন নজিবুর নেই। সামনে একটা ইজেলে বিশাল ক্যানভাস দেখা যাচ্ছে। অর্ধ সমাপ্ত পেইন্টিংটা একটা মেয়ের, কমলা রঙের বালির ওপর শুয়ে আছে, পা দুটো ফাঁক করা, হাত দুটো প্রসারিত, শরীরের বড় আকৃতির ফুটোগুলো থেকে রক্ত বেরিয়ে আসছে। আতঙ্কে চোখের পাতা ফেলতেও ভুলে গেলেন নাফিসা। আধুনিক শিল্প না হয় কোন নিয়ম-নীতি মানে না, কিন্তু তাই বলে এরকম···। তাঁর চেহারা কঠিন হয়ে উঠল। নজিবুরকে এ-সব আঁকা বন্ধ করতে বলতে হবে। কিন্তু কোথায় সে?

হলরুমে পাওয়া গেল খয়েরউদ্দিনকে। খয়ের ত্রিশ বছর ধরে এ-বাড়িতে তাঁর চাকরি করছে। বাড়ির কর্তা খয়েরকে তাড়াবার কম চেষ্টা করেননি, কিন্তু নাফিসা ভেটো দেয়ায় তা সম্ভব হয়নি। খয়ের সব সময় তাঁর অনুগত, প্রভুভক্ত কুকুরের মত তাঁর সেবা করে। দীর্ঘ বহু বছর এক বাড়িতে থাকা, ফলে তার সঙ্গে তিনি গোপন পরামর্শ করতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। স্বামীকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, ছেলেকে কিভাবে গড়ে তোলা যায় ইত্যাদি বিষয়ে খয়েরই তাঁর বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা।

খয়েরের অনেক গুণের একটা হলো, চাওনা না হলে সে কোন পরামর্শ দেয় না। পরে অবশ্য নাফিসা জানতে পারেন, খয়ের আফিম খায়। প্রথমে অসন্তুষ্ট হলেও, পরে একটা কথা ভেবে খুশিই হন তিনি। আফিম খেতে হলে বেতনের টাকায় কুলাবে না, ফলে অতিরিক্ত টাকা দরকার হবে তার। সেই অতিরিক্ত টাকা এতদিন সে নিশ্চয়ই চুরি করেছে। এখন থেকে তার বেতন বাড়িয়ে দেবেন তিনি। ফলে তাঁর চাকরি ছেড়ে অন্য কোথাও যাবার কথা ভাববে না সে।

'নজিবুর কোথায় জানো, খয়ের?'

গৃহকর্ত্রীর দিকে তাকাল খয়ের, চোখ দুটো ভেজা পাথরের মত। 'ছোট সাহেব বড় সাহেবের অফিসে।'

'ওর বাপের অফিসে? সেখানে কি করছে সে?' ভুরু কোঁচকালেন নাফিসা।

ঘন ভুরু সামান্য একটু উঁচু করল খয়ের। বেশি কথা বলার লোক নয় সে।

থমথমে চেহারা নিয়ে স্বামীর অফিসে চলে এলেন নাফিসা। বিশাল এই কামরাতে বসেই ব্যবসা পরিচালনা করতেন শফিকুর রহমান। তিনি মারা যাবার পর ম্যানেজারদের সঙ্গে ড্রইংরুমে বসেই ব্যবসায়িক আলোচনা করেছেন নাফিসা, এই অফিসে খুব কম ঢুকেছেন। স্বামীর চেয়ারে ছেলেকে বসে থাকতে দেখে একটা ধাক্কা খেলেন তিনি। টেবিলের ওপর ফাইলের স্তূপ। সেগুলো খুলে পড়ছে নজিবুর, দু'একটা মন্তব্য লিখছে। 'এখানে কি করছ তুমি?' কঠিন সুরে জিজ্ঞেস করলেন নাফিসা।

লম্বাটে আঙুলে কলম, মুখ তুলে মায়ের দিকে তাকাল নজিবুর। 'আব্বু মারা যাবার পর এই অফিসে আমিই তো বসব। ভাল কথা, তুমি কি জানো, আব্বুর ব্যবসাগুলো সব মার খেয়েছে?' হাসল নজিবুর। 'কিন্তু আমার একটা ব্যবসাও লোকসানের মুখ দেখেনি?'

'মার খাক, লাভ করুক, এ-সব নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না,' বললেন নাফিসা। 'তোমার আব্বু নেই, কিন্তু আমি তো আছি। কাজেই ব্যবসার সব কাজ আমিই দেখাশোনা করব। তুমি শিল্পী, তোমার কাজ ছবি আঁকা, সেটাই মন দিয়ে করবে তুমি।'

হাসিমুখেই মাথা নাড়ল নজিবুর। 'আমাকে অনেক জ্বালিয়েছ তুমি। নাকে দড়ি দিয়ে কম ঘোরাওনি। এখন আমার পালা। আমি

যা বলব তাই হবে।'

নাফিসার মনে হলো শুনতে ভুল হচ্ছে তাঁর। নজিবুর কথা বলছে? এই ভাষায়? এ তিনি কিভাবে বিশ্বাস করেন! 'নজিবুর, কি ভাষায় কার সঙ্গে কথা বলছ তুমি? চেয়ার ছেড়ে ওঠো, এই মুহূর্তে নিজের স্টুডিওতে চলে যাও। যাও, যাও বলছি! মনে রেখো, আমি তোমার আম্মা!'

কলমটা টেবিলে রেখে হাত দুটো বুকে ভাঁজ করল নজিবুর। ছেলের হাবভাবে এমন পাষাণ একটা ভাব ফুটল, মনে মনে আঁতকে উঠলেন নাফিসা। নজিবুরকে ঠিক যেন তাঁর কাকার মত লাগছে দেখতে। সুলতান কাকা চল্লিশ বছর আগে মারা গেছেন। কিন্তু তাঁর কথা মনে পড়লে এখনও ভয়ে গায়ে কাঁটা দেয় নাফিসার।

দশ বছর বয়েসে নাফিসাকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করেন সুলতান। ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যায়, ফলে পাগলামির অভিনয় শুরু করেন নাফিসার কাকা। নাফিসার বাবা পারিবারিক সম্মান রক্ষার জন্যে ভাইকে পাগলাগারদে পাঠিয়ে দেন। দু'বছর সেখানে থাকার পর আত্মহত্যা করে সে।

'সম্পত্তি বলতে এই বাড়িটাই শুধু তোমার,' জননীকে বলল নজিবুর। 'ভাড়া বাবদ মাসে ত্রিশ হাজার টাকা দেয়া হবে তোমাকে। তবে ইচ্ছে করলে এই বাড়ি তুমি আমার কাছে বিক্রিও করে দিতে পারো। মানে, যদি তুমি আমার সঙ্গে থাকতে না চাও আর কি।'

'এ-সব কি বলছিস তুই, নজিবুর?'

'সয়-সম্পত্তি, আয়-রোজগার সম্পর্কে সবারই একটা পরিষ্কার ধারণা থাকা উচিত,' বলল নজিবুর। 'কার কি ক্ষমতা সেটা টাকা

দিয়ে মাপা হয়। মাসিক ত্রিশ হাজার টাকা ইনকাম তোমার, কাজেই নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে একটা ধারণা পেয়ে গেলে তুমি। ভবিষ্যতে আমার কোন ব্যাপারে অহেতুক নাক গলাতে ইচ্ছে হলে, নিজের ক্ষমতা কতটুকু সেটা ভেবে দেখো।'

ছেলের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন নাফিসা। উপলব্ধি করলেন, ছেলের ওপর তাঁর যে প্রভাব ছিল, তা আর নেই। নজিবুর শুধু অচেনা পুরুষ হয়ে ওঠেনি, তাঁর কাকার মত পাগল হয়ে গেছে। কিংবা পাগল হবার ভান করছে।

ঘুরে অফিস কামরা থেকে বেরিয়ে এলেন নাফিসা, সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে। দরজার কবাটে কান ঠেকিয়ে ওদের কথা শুনছিল খয়ের, নাফিসার পিছু নিয়ে হলরুমে চলে এল। ধবধবে সাদা একটা রুমাল বাড়িয়ে দিল সে কর্ত্রীর দিকে। সেটা নিয়ে চোখ মুছলেন নাফিসা। 'নজিবুর পাগল হয়ে গেছে!' চাপা স্বরে বললেন তিনি। 'এখন আমি কি করব?'

'বেগমসাহেবা, আপাতত আপনার কিছু করার নেই,' নরম সুরে বলল খয়ের। 'আপনাকে বলি বলি করেও বলা হয়নি–ছোট সাহেবকে কখনোই আমার স্বাভাবিক মানুষ বলে মনে হয়নি। বেগমসাহেবা, আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। আশায় আশায় থাকতে হবে, একদিন পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটবে।'

এটা পাঁচ মাস আগের ঘটনা। এই ঘটনার পর বাড়িতে নতুন একটা চাকরানী এসেছে, নাম সামিনা। সামিনা মধ্যবয়স্কা। সে বোবা ও কালা। দোতলা ও একতলার মাঝখানে লোহার গেট বসিয়ে বাড়িটাকে দু'ভাগে ভাগ করে নিয়েছে নজিবুর। একতলায় সামিনা আর খয়েরকে নিয়ে নাফিসা থাকেন, দোতলায় একা থাকেন নজিবুর। নজিবুর একতলায় নামতে পারে, কিন্তু খয়ের বা

নাফিসার দোতলায় ওঠার অনুমতি নেই। নজিবুরের সব কাজ সামিনাই করে, রান্না থেকে শুরু করে ঘরদোর পরিষ্কার, কাপড় ধোয়া, ফাই-ফারমাশ খাটা, সব। ছেলের সঙ্গে কালেভদ্রে দেখা হয় নাফিসার, কথা হয় আরও কম। নজিবুরের জন্যে একতলার কিচেনেই রান্না করে সামিনা। ট্রেতে খাবার নিয়ে লোহার গেটে এসে কলিংবেল বাজায় সে। নজিবুর সিঁড়িতে নেমে এসে গেট খুলে দিলে সামিনা ওপরে ওঠে। নজিবুর খুব কম খায়। দুপুরে দু'টুকরো মাছ, সালাড, আর একটা রুটি। রাতে এক বাটি খাসীর মাংস, একটা রুটি। কিংবা রোস্ট করা একটা মুরগি।

অনেকগুলোই গাড়ি ওদের, তবে শুধু মার্সিডিজটা নিয়েই মাঝে মধ্যে বাইরে বেরোয় নজিবুর।

তারপর একদিন নজিবুর বাইরে বেরুবার পর খয়েরকে ডেকে নাফিসা জানতে চাইলেন, সামিনা কোথায়? খয়ের জানাল, তাকে দোতলায় রেখে গেটে তালা দিয়ে বেরিয়ে গেছে ছোট সাহেব। নাফিসার মনে কৌতূহল জাগল, দোতলায় একা একা কি করছে সামিনা! খয়েরকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, দোতলায় কি ওঠা যায়? খয়ের মাথা ঝাঁকিয়ে জানাল, যায়, গেটের তালা খোলার ব্যবস্থা অনেক আগেই করে রেখেছে সে।

ডুপ্লিকেট করা চাবি দিয়ে তালা খুলে দোতলায় উঠলেন নাফিসা, খয়েরকে নিয়ে ঢুকে পড়লেন ছেলের স্টুডিওতে। ঢুকেই পাথর হয়ে গেলেন তিনি। স্টুডিওটাকে একটা নরক বললেই হয়। দেয়ালে দেয়ালে এমন বীভৎস সব ছবি ঝুলছে, দেখে জ্ঞান হারাবার অবস্থা হলো তাঁর। নগ্ন নারী ছাড়া অন্য কোন ছবি খুব কমই এঁকেছে নজিবুর। নারী নেই, এরকম মাত্র একটা ছবি দেখতে পেলেন তিনি। ছবিতে চাঁদটাকে রক্তলাল দেখাচ্ছে, আকাশটা

ভীতিকর কৃষ্ণবর্ণ, সৈকত কমলা রঙের। স্টুডিওর এক কোণে লাইফ-সাইজ একটা পোর্ট্রেইট রয়েছে, সেটা তাঁরই ছবি–নাফিসার। নাফিসার দাঁত থেকে রক্ত ঝরছে, হাঁ করা মুখের ভেতর পুরুষের একজোড়া পা ঢোকানো, পায়ে সাদার ওপর লাল ডোরা কাটা ট্রাউজার–বাড়িতে তাঁর স্বামী এই ট্রাউজার পরতেন। ছবিতে দেখা যাচ্ছে নাফিসার মাথার পিছনে একজোড়া শিং গজিয়েছে।

ছবির দিকে তাকিয়ে আছেন নাফিসা, এক সময় প্রায় জ্ঞান হারিয়ে খয়েরের গায়ে হেলান দিলেন। খয়ের তাঁকে ধরে নিচে নামিয়ে আনল। বেগমসাহেবাকে তাঁর ঘরে পৌঁছে দিয়ে নিজের কামরায় চলে এল সে, ছোট টিনের একটা কৌটা খুলে খানিকটা আফিম খেলো–পরিমাণ বা আকারে একটা মসুর ডালের বেশি হবে না। তারপর কিচেনে ঢুকে দু'কাপ কড়া কফি বানিয়ে ফিরে এল বেগমসাহেবার বেডরূমে।

কফির কাপে চুমুক দিয়ে জিভ পুড়িয়ে ফেললেন নাফিসা। 'শুধু পাগল নয়, নজিবুর রীতিমত বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে, খয়ের। এখন আমাদের কি করা উচিত?'

এবারও মাথা নাড়ল খয়ের। 'আমাদের কিছু করার নেই, বেগমসাহেবা। আরও অপেক্ষা করতে হবে।' কাজেই নাফিসা অপেক্ষা করছিলেন।

তারপর, যেদিন সন্ধ্যারাতে খুন হলো শ্যামলি, সেদিন রাতে সাংঘাতিক একটা জিনিস আবিষ্কার করল খয়ের। বেগমসাহেবাকে বলল, 'স্টোররূমে আসুন, দেখে যান।' খয়েরের পিছু নিয়ে স্টোর রূমে চলে এলেন নাফিসা।

'দেখুন, বেগমসাহেবা,' বলে হাত তুলে রক্তমাখা কাপড়গুলো

দেখাল সে।

নাফিসা দেখামাত্র স্বামীর জ্যাকেট আর ছেলের ট্রাউজার ও জুতো জোড়া চিনতে পারলেন। সবগুলোতেই রক্তের দাগ লেগে রয়েছে। কাপড়গুলোর সঙ্গে পিন দিয়ে আঁটা একটা চিরকুটও রয়েছে, তাতে লেখা– 'এগুলো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পুড়িয়ে ফেলতে হবে।' হাতের লেখা নজিবুরের, নির্দেশটা সে সামিনাকে দিয়েছে।

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন নাফিসা। আজও তাঁকে ধরে বেডরূমে পৌঁছে দিল খয়ের। টিভিতে রাত দশটার খবরে বলা হলো, কল্যাণপুর বস্তির কাছে একটা মেয়ের পেট চেরা লাশ পাওয়া গেছে। শুনে আরেক বার কেঁদে উঠলেন নাফিসা। ছেলেকে তিনি খুনী বলে ভাবতে পারছেন না। অথচ কাপড়চোপড়ে রক্ত লেগে থাকার কোন ব্যাখ্যাও তাঁর জানা নেই। খয়েরকে তিনি বললেন, 'খয়ের! আমরা কাউকে কিছু জানাব না! সবার কাছে ছেলের এত প্রশংসা করি, তারা যদি জানতে পারে সে খুনী, সমাজে আমার মর্যাদা বলে আর কিছু থাকবে না। বাড়ির বাইরে বেরুনো চিরকালের জন্যে বন্ধ হয়ে যাবে আমার।' হঠাৎ নিষ্ঠুর দেখাল তাঁকে। 'যাও, খয়ের, কাপড়গুলো এখুনি পুড়িয়ে ফেলো!'

রাতেই এতিমখানায় গিয়ে খোঁজ নিল কামাল। সংশ্লিষ্ট দফতরের লোকজনকে প্রশ্ন করে সে জানতে পারল, শফিকুর রহমানের প্রচুর কাপড়চোপড় দান হিসেবে তারা পেয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেগুলোর মধ্যে নীল রঙের কোন জ্যাকেট ছিল না।

পরদিন সকাল আটটা দশে হায়দার আলির বাড়িতে আবার হাজির হলো শহীদ, কামালকে নিয়ে। দরজা খুলে ওদেরকে দেখে

ফ্যাকাসে হয়ে গেল হায়দারের চেহারা। দরজার চৌকাঠ ধরে একপাশে দাঁড়িয়ে থাকল সে, তাকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢুকে সোফায় বসল ওরা। 'আবার আসতে হলো, মি. হায়দার। শাকুর অ্যান্ড সন্সের মালিক শাকুর সাহেব বলছেন, জ্যাকেটের সঙ্গে একজোড়া অতিরিক্ত বোতাম দেয়া হয়েছিল। ওগুলো আমরা একটু দেখতে চাই।'

'অতিরিক্ত বোতাম!' হাঁ করে তাকিয়ে থাকল হায়দার। তারপর কোন রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'দুঃখিত, এ ব্যাপারে আমি কোন সাহায্য করতে পারব না। ডুপ্লিকেট বোতাম দেয়া হয়েছিল, এ-কথা আমি মনে করতে পারছি না।'

'শাকুর সাহেব বলছেন, দেয়া হয়েছে,' বলল শহীদ।

'দেখুন, শহীদ সাহেব, এ-সব ব্যাপার আমার স্ত্রী খেয়াল রাখেন। তিনি এখন খুলনায়, তাঁর অসুস্থ আব্বুকে দেখতে গেছেন। এখন আমি অফিসে যাচ্ছি, ফিরে এসে খুঁজে দেখতে পারি। পেলে আপনাকে জানাব। তা না হলে আমার স্ত্রী না ফেরা পর্যন্ত আপনাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে।'

'ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, মি. হায়দার,' বলল শহীদ। 'অফিসে যাবার আগেই খুঁজে দেখবেন, প্লীজ।'

'হ্যাঁ, যদি সময় পাই।'

শহীদ ও কামাল বিদায় নিতেই বেডরূমে ফিরে এসে আলমিরা খুলল হায়দার। শাহানা বড় একটা কাঠের বাক্সে টুকিটাকি জিনিস-পত্র রাখে, বোতামগুলো থাকলে ওটাতেই থাকবে। বুকের ভেতর হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে তার, বাক্সটা বের করে ঢাকনি তুলে ভেতরে তাকাল। কয়েক ডজন বোতাম রয়েছে, কিন্তু তামার বোতাম একটাও নেই। তারপর পাওয়া গেল! কিন্তু দুটো নয়, মাত্র

একটা। অনেক খুঁজেও দ্বিতীয় বোতামটা পেল না সে।

পাগলের মত হয়ে গেল হায়দার। আলমিরার প্রতিটি দেরাজ পরীক্ষা করল সে। নেই। টেবিলের দেরাজেও নেই। বাড়ির কোথাও আর খুঁজতে বাকি রাখল না। কিন্তু দ্বিতীয় বোতামটা কোথাও পেল না।

অফিসে ফিরেই খুলনা পুলিস হেডকোয়ার্টারে ফোন করল শহীদ। ডক্টর শাহানার বাবা নামকরা সরকারী উকিল ছিলেন, ভদ্রলোকের বাড়ির টেলিফোন নম্বরটা সংগ্রহ করতে কোন সমস্যা হলো না। শাহানার বাবা খানিকটা সুস্থ হওয়ায় হাসপাতাল থেকে বাড়িতে ফিরে গেছেন। শাহানাকেও সেখানে পাওয়া গেল। শহীদ তাকে জ্যাকেট প্রসঙ্গে প্রশ্ন করায় বিস্মিত হলো সে। শহীদ ব্যাখ্যা করল, বিচলিত হবার মত কোন ব্যাপার নয়, স্রেফ রুটিন এনকোয়ারি। 'আমরা শুধু জানতে চাই, আপনার স্বামী নীল যে জ্যাকেটটা কিনেছিলেন, সেটার সঙ্গে ডুপ্লিকেট কোন বোতাম দেয়া হয়েছিল কিনা।'

শাহানা জানাল, 'হ্যাঁ, অতিরিক্ত দুটো বোতাম ছিল। সেগুলো আমার একটা কাঠের বাক্সে আছে। কিন্তু কি ব্যাপার বলুন তো? এই তথ্য কেন আপনি জানতে চাইছেন?'

'ধন্যবাদ, মিসেস আলি,' বলল শহীদ। 'আপনার চিন্তার কোন কারণ নেই। প্রয়োজন মনে করলে পরে সব কথা আপনাকে ব্যাখ্যা করা হবে।'

রিসিভার রেখে দিল শহীদ। 'এবার দেখতে হবে হায়দার আলি মিথ্যে কথা বলেছে কিনা।' ফোনের রিসিভার তুলে আবার ডায়াল করল ও, এবার হায়দার আলির অফিসে।

'হ্যালো?' অপরপ্রান্তে হায়দারই ফোন ধরল।

'প্রাইভেট ডিটেকটিভ শহীদ খান। মি. হায়দার, খুঁজেছেন?'

বুক ভরে বাতাস নিল হায়দার। চেষ্টা করল গলাটা যাতে না কাঁপে। 'শাকুর সাহেব নিশ্চয়ই ভুল করেছেন, শহীদ সাহেব। এখন আমি নিশ্চিত, তিনি অতিরিক্ত কোন বোতাম আমাকে দেননি। দিলে আমার মনে থাকত।'

'দেননি!'

'না।'

'আপনি কি পুরোপুরি নিশ্চিত, মি. হায়দার? আপনাকে আমি আগেই জানিয়েছি, এটা একটা মার্ডার কেস। আবার জিজ্ঞেস করছি, আপনি হানড্রেড পার্সেন্ট নিশ্চিত?'

রিসিভারটা এত জোরে আঁকড়ে ধরল হায়দার, আঙুলের গিঁটগুলো সাদা হয়ে গেল। 'হ্যাঁ, আমি পুরোপুরি নিশ্চিত।'

'ধন্যবাদ।'

রিসিভারটা ধীরে ধীরে নামিয়ে রেখে গালে হাত দিয়ে বসে থাকল হায়দার, শূন্য দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আছে। অত্যন্ত বিপজ্জনক একটা ঢিল ছোঁড়া হয়ে গেছে, যার পরিণাম হতে পারে ভয়াবহ। শহীদ খান শখের গোয়েন্দা হলে কি হবে, কাজে কোন খুঁত রাখেন না, ভাবল সে। খুলনায় ফোন করে শাহানাকেও প্রশ্নটা করতে পারে। কাজেই এখুনি তার উচিত শাহানাকে সাবধান করে দেয়া। শ্বশুর কেমন আছে জানার ছুতোয় টেলিফোন করা যেতে পারে।

রিসিভারটা আবার ধরতে যাবে, ফোনটা বেজে উঠল। খুলনা থেকে শাহানাই ফোন করেছে। প্রথমেই হায়দার শ্বশুরের খবর নিল। শাহানা বলল, 'আব্বু এখন ভালই আছেন। শোনো, আমি

যে কারণে ফোন করেছি। এক দেড় ঘণ্টা আগে ঢাকা থেকে অদ্ভুত এক ফোন কল পেয়েছি আমি। শহীদ খানের নাম তো তুমি শুনেছই, নাম করা গোয়েন্দা। উনি আমাকে তোমার নতুন কেনা জ্যাকেটটার বোতাম সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। উনি নাকি তোমার সঙ্গেও আলাপ করেছেন। ব্যাপারটা কি বলো তো?'

বোবা হয়ে গেল হায়দার। চেষ্টা করেও কথা বলতে পারছে না।

'উনি ডুপ্লিকেট একজোড়া বোতামের কথা জানতে চাইছিলেন,' বলে চলেছে শাহানা। 'আমি বললাম, ওগুলো একটা কাঠের বাক্সে রাখা আছে। এই বোতাম কেন উনি খুঁজছেন...'

'তো-তোমাকে পরে বলব,' ভাঙা গলায় বলল হায়দার। 'তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোন ব্যাপার নয়। অফিসে অনেক কাজ, এখন রাখি।' পকেটে হাত ভরে অতিরিক্ত বোতামটা আঙুল দিয়ে নাড়াচাড়া করছে সে। রীতিমত অসুস্থ লাগছে তার। চেয়ারে বসে টেবিলে মাথা ঠেকাতে যাবে, এই সময় ভেতরে ঢুকল তসলিমা।

'আবার কি ঘটল?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইল সে।

বোতাম নিয়ে কি ঘটছে, ধীরে ধীরে সবই তাকে শোনাল হায়দার। হায়দারের টেবিলের কিনারায় বসে পা দোলাতে দোলাতে শুনে গেল তসলিমা। সবশেষে হায়দার বলল, 'ডুপ্লিকেট বোতাম একজোড়া, কিন্তু একটা পাওয়া যাচ্ছে না! মেয়েটাকে খুন করার অভিযোগে পুলিস আমাকে গ্রেফতার করতে পারে! শাহানার মুখ থেকে শোনার পর শহীদ খান এখন ডুপ্লিকেট বোতামগুলো দেখতে চাইবেন। তার ওপর, কাল সেই ব্ল্যাকমেইলারটা আসবে।'

'তার কথা তোমাকে ভাবতে হবে না,' হায়দারকে আশ্বস্ত

করল তসলিমা, কৌতুকে চোখ জোড়া চকচক করছে। 'তার ব্যাপারটা তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও।' টেবিল থেকে হড়কে নেমে গেল। তারপর চেহারা কঠিন করল, ধমকের সুরে বলল, 'শক্ত হও, হায়দার! নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখো।'

ইন্সপেক্টর মিনহাজ হোসেনকে ফোন করে তামার বোতামটা সম্পর্কে সব কথাই বলল শহীদ, শুধু বলল না কার কাছ থেকে পেয়েছে ওটা। উত্তেজিত ইন্সপেক্টর হেডকোয়ার্টারের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করলেন। কর্মকর্তারা জানালেন, বেশ ভাল কথা, নেসার আহমেদের কর্মচারী হায়দার আলি মিথ্যে কথা বলছে, কিন্তু তারমানে কি এই যে শ্যামলিকে সেই খুন করেছে? সে নেসার আহমেদের মেয়ের সঙ্গে নির্জন বাড়িতে কয়েক ঘণ্টা ছিল, এটা যদি তাকে স্বীকার করতে বাধ্য করা হয়, নেসার আহমেদের মান-সম্মান ধুলোয় লুটাবে। কর্মকর্তারা নাফিসা বেগমকেও চটাতে রাজি নন। মন্ত্রী-মিনিস্টাররা তাঁর বন্ধু। নাফিসা বেগম চাকরি হয়তো খেতে পারবেন না, তবে বদলি করাতে পারবেন। তাঁরা ইন্সপেক্টরকে বুদ্ধি দিলেন, যা কিছু করা দরকার সবই আপনি শহীদ খানকে দিয়ে করান–ধরি মাছ না ছুঁই পানি আর কি।

ইন্সপেক্টর সে–ব্যবস্থাই করলেন। জীপ নিয়ে বনানীতে এলেন, সামনে থাকল শহীদ খানের টয়োটা।

এবার ওদেরকে দরজা থেকে বিদায় করতে পারল না খয়েরউদ্দিন। পুলিস দেখে ড্রইংরুমে বসাল। খানিক পর নাফিসা বেগম এসে ওদের মুখোমুখি বসলেন। মেকআপ করা চেহারায় গাম্ভীর্য ও অসন্তোষ। বললেন, 'খয়েরের কাছে শুনেছি আপনারা

আমার মরহুম স্বামীর একটা জ্যাকেট খুঁজছেন। সে আপনাদেরকে জানিয়েছে, সমস্ত কাপড়চোপড়ের সঙ্গে সেটাও এতিমখানায় দান করা হয়েছে। তারপরও আপনারা আমাকে বিরক্ত করতে এলেন কেন?'

'এতিমখানা থেকে বলা হয়েছে এই বাড়ি থেকে যে কাপড়চোপড় দেয়া হয়েছিল সেগুলোর মধ্যে নীল রঙের কোন জ্যাকেট ছিল না,' বলল শহীদ।

'তারা তা বলতেই পারে,' জবাব দিলেন নাফিসা। 'দামী জ্যাকেট, নিজেরাই কেউ একজন চুরি করেছে।'

'এটা অত্যন্ত গুরুতর অভিযোগ, মিসেস রহমান,' বলল শহীদ। 'কোন প্রমাণ ছাড়া কাউকে চোর বলা...'

'গুরুতর কিনা জানি না, তবে আবারও ওই কথা বলছি আমি, জ্যাকেটটা ওরা কেউ চুরি করেছে–এতিমখানায় দেয়নি। পুলিসের কাজ আমাকে বিরক্ত করা নয়, চোরকে খুঁজে বের করা। এখন আপনারা আসতে পারেন। এরপরও যদি আমাকে বিরক্ত করা হয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে ব্যাপারটা জানাতে বাধ্য হব আমি।'

পাঁচ

জাতীয় দৈনিক 'তাজা খবর'-এর একজন ক্রাইম রিপোর্টার কল্যাণপুর বস্তির কেয়ারটেকার রুস্তম বেপারির সঙ্গে কিছুক্ষণ

আলাপ করল। রুস্তম বেপারি টেপিকে ডেকে বলল, 'এই টেপি, সাবেরে শওকতের ঘরটা দেহায়া দে।' তারপর রিপোর্টারকে বলল, 'সাংবাদিক সাব, চা আনতে পাঠাইছি, না খায়া যাইবেন না।'

দরজা খোলাই ছিল, চৌকির ওপর বসে সিগারেট ফুঁকছে শওকত, আর পা দোলাচ্ছে। ভেতরে না ঢুকে ক্রাইম রিপোর্টার দ্রুত তার একটা ছবি তুলে ফেলল। ক্যামেরার ক্লিক শব্দ শুনে ঝট করে মুখ তুলল শওকত। 'এই মিয়া, কে আপনি? ফটো তুললেন কেন?'

ক্রাইম রিপোর্টার এক গাল হেসে বলল, 'শুনলাম লাশটা যেখানে পড়ে ছিল, ওই রাস্তা ধরেই সেই রাতে বস্তিতে আসেন আপনি। ভাবলাম, আপনাকে নিয়ে একটা রিপোর্ট করি তাজা খবরে। মাত্র কয়েকটা প্রশ্ন করব, আপনি কি খুনীকে বা খুনী বলে সন্দেহ হয় এমন কাউকে দেখেছেন বস্তিতে আসার পথে?'

পুলিসের চেয়ে সাংবাদিককে বেশি ভয় পায় শওকত। চৌকি থেকে নেমে দরজা বন্ধ করে দিল সে, ভেতর থেকে বলল, 'আমার কিছু বলার নেই।'

পরদিন তাজা খবরে শওকতের ছবি সহ খবরটা বেরুল। তাতে লেখা হলো, শওকতের আচরণ অত্যন্ত সন্দেহজনক। সাংবাদিকদের কোন প্রশ্নেরই উত্তর দিতে রাজি হয়নি সে। খুনটা ঘটতে যদি সে না-ও দেখে থাকে, ওই সময় বস্তিতে আসার পথে খুনীকে তার অবশ্যই দেখতে পাবার কথা। রিপোর্টার তসলিমারও একটা ছবি কোথাও থেকে সংগ্রহ করেছে। লিখেছে, অকুস্থলের কাছাকাছি থাকেন, অথচ বলছেন কিছুই তিনি জানেন না।

এই রিপোর্ট নজিবুর রহমানও পড়ল। চোখ সরু হয়ে গেল

তার, ঠোঁটের কোণে এক চিলতে নিষ্ঠুর হাসি ফুটল। সিদ্ধান্ত নিল, শওকতের ব্যাপারে কিছু একটা করতে হবে তাকে। তা না হলে বিপদ হয়ে দেখা দিতে পারে সে। বিপদ হোক বা না হোক, তৈলচিত্রের ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট করা যায় তাকে।

সকাল বেলা অফিসে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে শহীদ, মহুয়া ওর টাইয়ের নট বাঁধার সময় বলল, 'কাল আবার সেই জটাধারী ভিখারিটা এসেছিলেন!'

'জটাধারী...তারমানে কুয়াশা?' শহীদ বিস্মিত।

'হ্যাঁ,' বলে হাসি চাপল মহুয়া। 'তুমি কিন্তু হাসবে না। দাদা আরও একটা ক্লু দিয়ে গেছেন।'

'আরও একটা ক্লু? কি?'

'বললেন, তোমাকে প্রথমে একটা রক্তলাল চাঁদ খুঁজতে হবে। তারপর খুঁজতে হবে কালো একটা আকাশ। সবশেষে কমলা রঙের সৈকত। শুধু তারপরই, এর আগে নয়, ম্যানিয়াকটাকে খুঁজে পাবে তুমি।'

মহুয়া বারণ করা সত্ত্বেও গলা ছেড়ে হেসে উঠল শহীদ। তারপর বলল, 'এটাকে তো একটা ধাঁধার মত লাগছে, ক্লু বলছ কেন?'

'দাদা বললেন, টেলিপ্যাথী চর্চা করার সময়, ধ্যানমগ্ন অবস্থায়, এই সূত্র পেয়েছেন। তোমাকে বলতে বলেছেন, বললাম। তোমার যদি ভাল না লাগে মন থেকে মুছে ফেলো।'

শহীদকে চিন্তিত দেখাল। 'টেলিপ্যাথীর আমি কি বুঝি, বলো। আর কিছু বলেছে?'

মহুয়া মাথা নাড়ল।

'ঠিক আছে, ধাঁধাটা আমার মনে থাকবে,' বলে অফিসের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ল শহীদ।

অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে কোন রেস্তোরাঁয় ঢুকে খেয়ে নিতে হবে, কিন্তু কথাটা মনে থাকল না হায়দারের। ফ্ল্যাটে ঢুকে পায়চারি শুরু করল সে, কান খাড়া হয়ে আছে কলিংবেলের আওয়াজ শোনার জন্যে। শহীদ খান ধরে ফেলেছেন সে মিথ্যে কথা বলেছে। কাজেই আবার তিনি আসবেন, এবং এবার তাঁর সঙ্গে পুলিসও থাকবে!

বেশ কয়েক মাস আগে তার এক বন্ধু তাকে বিদেশী একবোতল হুইস্কি প্রেজেন্ট করেছিল, কথাটা মনে পড়তে আলমিরা খুলে বোতলটা বের করল হায়দার। পানি মিশিয়ে এক দেড় আউন্স খেতেই গরম হয়ে উঠল শরীর, মাথার ব্যথাটাও সেরে গেল। পায়চারি থামিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করার জন্যে খাটের ওপর বসতে যাবে, কলিংবেলটা বেজে উঠল। গরম শরীর আবার ঠাণ্ডা হয়ে গেল তার। তাড়াতাড়ি বেডরুম থেকে বেরিয়ে এসে ড্রইংরুমে ঢুকল, কে এসেছে জিজ্ঞেস না করেই খুলে ফেলল দরজাটা।

সামনে তসলিমাকে দেখে হাঁ হয়ে গেল হায়দার। 'তুমি? ওহ্, খোদা! তুমি কেন এখানে এসেছ?'

কাঁধের এক ধাক্কায় হায়দারকে সরিয়ে দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল তসলিমা। নিজেই বন্ধ করল দরজা। 'গন্ধটা আমি চিনি, দারা,' বলল সে। 'তুমি হুইস্কি খাচ্ছ!'

'কোন সাহসে এখানে এলে তুমি? কেউ দেখে ফেললে...'

হায়দারের সামনে হাতের মুঠো খুলল তসলিমা। 'দেখো।'

তার হাতের তালুতে তামার একটা বোতাম। 'এটাই তো আমার দরকার, তাই না?'

বোতামটা দেখে বিরাট স্বস্তিবোধ করল হায়দার। 'কিন্তু তুমি এটা পেলে কোথায়?'

খিলখিল করে হেসে উঠল তসলিমা। এতক্ষণে লক্ষ করল হায়দার,' তসলিমার পরনে আঁটসাঁট জিনস আর টি-শার্ট। 'বঙ্গবাজারে গেলাম, শাকুর অ্যান্ড সঙ্গে ঢুকে একটা জ্যাকেট থেকে ব্লেড দিয়ে কেটে নিলাম। জ্বী, না, খদ্দেরদের ভিড়ে কেউ আমাকে ভাল করে লক্ষই করেনি। ওরা ধরে নেবে বোতামটা পড়ে গেছে।'

হায়দারের মনে হলো হঠাৎ তার বয়েস দশ বছর কমে গেছে। বোতামটা নেয়ার জন্যে হাত বাড়াল সে। কিন্তু তসলিমা মুঠোটা বন্ধ করে ফেলল। 'তোমার বেডরুমটা কোনদিকে, দারা? এত বড় একটা সমস্যার সমাধান করেছি, এসো রাতটা আমরা গল্প করে কাটাই। বাড়িতে খাবার কি আছে বলো, আমার প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে...'

কলিংবেলের আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল হায়দারের। প্রথমেই দেয়ালঘড়ির ওপর চোখ পড়ল। কি আশ্চর্য, ন'টা বাজে! তারপরই কাল রাতের কথা মনে পড়ে গেল। ঝট করে ঘাড় ফেরাতেই দেখল, বিছানায় তার পাশে শুয়ে রয়েছে তসলিমা। ওহ, খোদা!

আবার কলিংবেল বাজল।

লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে লুঙ্গি পরল হায়দার!।

'কি হয়েছে তোমার? দেখে মনে হচ্ছে বাড়িতে আগুন লেগেছে?' বালিশ থেকে মাথা তুলে জিজ্ঞেস করল তসলিমা।

'শুনতে পাচ্ছ না কলিংবেল বাজছে!' চাপা স্বরে হিস হিস করে উঠল হায়দার। 'সম্ভবত পুলিস এসেছে! তাড়াতাড়ি কোথাও লুকাও!'

অসহায় একটা ভঙ্গি করে বিছানা থেকে নামল তসলিমা। 'বেচারা দারা! সারাক্ষণ আতঙ্কে ভোগো তুমি!'

জবাব না দিয়ে ড্রইংরুমে চলে এল হায়দার। দরজা খুলল। সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ইন্সপেক্টর মিনহাজ হোসেন, সঙ্গে দু'জন কনস্টেবল। 'আপনারা? কি চান?' হঠাৎ রেগে গেল সে।

'বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত, হায়দার সাহেব,' ইন্সপেক্টর বললেন। 'প্রাইভেট ডিটেকটিভ শহীদ খান আপনার জ্যাকেট আর বোতাম সম্পর্কে সব কথা আমাদেরকে জানিয়েছেন। ওই বোতাম নিয়েই আপনার সঙ্গে কথা বলতে এলাম।'

'আসুন, বসুন,' বলে ওদেরকে ভেতরে ঢোকার পথ করে দিল হায়দার। 'শহীদ সাহেবকে আমিই আজ ফোন করতাম,' ইন্সপেক্টর বসার পর বলল। 'বোতামগুলো পেয়েছি। দেখুন, অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকায় উঠতে দেরি হয়ে গেছে আমার। কিছু যদি মনে না করেন, এখুনি আমাকে অফিসে যেতে হবে।'

'বোতাম দুটো আপনি পেয়েছেন?' ইন্সপেক্টরকে বিস্মিত দেখাল।

'আমার স্ত্রীর ছোট একটা বাক্সে ছিল,' বলল হায়দার। 'খুঁজতেই পেয়ে গেলাম।'

'ওগুলো আমাকে দেখাবেন, হায়দার সাহেব?'

'এখুনি আনছি,' বলে ড্রইংরুম থেকে বেরিয়ে এল হায়দার। বেডরুমে ঢুকে তসলিমাকে কোথাও দেখল না। নিশ্চয়ই বাথরুমে

লুকিয়েছে। চেয়ারের পিঠ থেকে জ্যাকেটটা ছোঁ দিয়ে তুলে নিল সে, এই সময় বেডরুমের দরজায় এসে দাঁড়ালেন ইন্সপেক্টর মিনহাজ। তাকে দেখে হায়দারের হৃৎপিণ্ড ছোট্ট একটা লাফ দিল।

ইন্সপেক্টর লক্ষ করলেন, বিছানার চাদর এলোমেলো হয়ে আছে, পাশাপাশি দুটো বালিশ ডেবে আছে মাঝখানে। আচ্ছা! ভাবলেন তিনি, রাতটা তাহলে হায়দার আলি একা কাটায়নি! 'আপনার স্ত্রী কবে ফিরবেন, কিছু বলেছেন?'

'বলতে পারছি না কবে ফিরবেন,' বলে জ্যাকেটের পকেট থেকে বোতাম দুটো বের করে ইন্সপেক্টরের বাড়ানো হাতে তুলে দিল হায়দার। 'নিন। এরপর আর দয়া করে আপনারা আমাকে বিরক্ত করবেন না, প্লীজ।'

বোতামগুলো দেখলেন ইন্সপেক্টর, তারপর মুখ তুলে বললেন, 'জ্যাকেটটা একবার দেখতে পারি?'

কথা না বলে জ্যাকেটটাও ইন্সপেক্টরের হাতে ধরিয়ে দিল হায়দার। 'আর কিছু?'

'এটা একটা মার্ডার কেস, হায়দার সাহেব,' বললেন মিনহাজ। 'সব কিছু আমাদেরকে খুঁটিয়ে দেখতে হয়। ডুপ্লিকেট বোতাম আর জ্যাকেটটা আমি যদি কয়েক দিনের জন্যে নিতে চাই, আপনি কিছু মনে করবেন?'

'দিন কয়েকের জন্যে? সারাজীবনের জন্যে নিলেও আমি কিছু মনে করব না! কাজ শেষ হলে ফেলে দেবেন কোথাও!'

'ফেলার কাজটা আপনাকেই করতে হবে, আপনার জিনিস আমি আপনাকে ফিরিয়ে দিয়ে যাব,' বিদায় নেয়ার সময় বলে গেলেন ইন্সপেক্টর।

দরজা বন্ধ করে বেডরুমে ফিরে এল হায়দার। দেখল আয়নার

সামনে দাঁড়িয়ে চুলে চিরুনি চালাচ্ছে তসলিমা। সে শাহানার চিরুনি ব্যবহার করছে, দেখে রাগ হলো তার। তবে কিছু বলল না। তসলিমা জিজ্ঞেস করল, 'পুলিস সন্তুষ্ট হয়েছে তো?'

তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে হায়দার বলল, 'এই সকালবেলা তুমি আমার সঙ্গে বেরুলে প্রতিবেশীরা কি ভাববে? শাহানাকে তারা যদি বলে দেয়, তাকে আমি কি জবাব দেব?'

'ঠিক আছে, আমিই আগে বেরিয়ে যাচ্ছি,' বলল তসলিমা। 'তোমার নিষ্কলুষ চরিত্রে কোন দাগ লাগুক, তা আমিও চাই না।' খিলখিল করে হেসে উঠল সে।

হায়দারের ইচ্ছে হলো মেয়েটার গলা টিপে ধরে।

তসলিমার চেয়ে আধ ঘণ্টা পর অফিসে পৌঁছুল হায়দার। পৌঁছেই পিয়নকে নাস্তা আনতে পাঠাল। পিয়ন তখনও ফেরেনি, ফোনটা বেজে উঠল। হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলল হায়দার। 'উদ্ধার বীমা কোম্পানি।'

'হায়দার?'

শাহানার গলা ঘুসির মত আঘাত করল হায়দারকে। 'কি ব্যাপার, শাহানা? কি হয়েছে?' কর্কশ গলায় জানতে চাইল সে।

'ওগো, আব্বুর অবস্থা ভাল নয়!' অপরপ্রান্তে ফুঁপিয়ে উঠল শাহানা। 'ডাক্তাররা বলছেন, প্রায় কোন আশাই নেই। আব্বু তোমাকে দেখতে চাইছেন।'

এক মিনিট পর রিসিভার নামিয়ে রেখে চেয়ার ছাড়ল হায়দার, এই সময় অফিসে ঢুকল তসলিমা। 'আবার কি হলো?' জানতে চাইল সে।

'আমার শ্বশুরের অবস্থা ভাল নয়, আমাকে এখুনি খুলনার বাস ধরতে হবে।'

'ব্ল্যাকমেইলার ছেলেটার কথা ভুলে গেছ? শওকতের কথা? কাগজে তাকে নিয়ে একটা রিপোর্ট বেরিয়েছে। আজ সে টাকার জন্যে আসবে, মনে নেই?'

'জাহান্নামে যাক শালা!' বলে দ্রুত অফিস থেকে বেরিয়ে গেল হায়দার।

রাত ন'টার দিকে, টেপি ঘুমিয়ে পড়েছে কিনা নিশ্চিত হয়ে, রুস্তম বেপারিকে শোভা বলল, 'শওকত বাইয়ের ভাত বাইরা রাখছি, যান দিয়া আহেন।'

অশ্লীল একটা গাল দিয়ে বেপারি বলল, 'ওই মাগী, আমারে তুই হুকুম করস! টেপি যখন জাইগা আছিল তখন কস নাই ক্যান?'

কৃত্রিম অভিমানে গাল ফুলিয়ে বসে থাকল শোভা, জবাব দিল না।

একটু পর বেপারি বলল, 'তুই যা। যাবি আর আবি, ফুসুর ফুসুর করবি না। বাসন-পেয়ালা কাল হকালে টেপি গিয়া নিয়া আইব।'

বাসন আর গ্লাস নিয়ে শওকতের ঘরের সামনে চলে এল শোভা। ভেতরে আলো জ্বলছে, কিন্তু কোন শব্দ হচ্ছে না। 'শওকত বাই, আপনের ভাত আনছি,' বলল শোভা। শওকত সাড়া দিচ্ছে না। মুখ টিপে হাসল সে। তার সন্দেহ হলো, শওকত বোধহয় চাইছে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকুক সে।

তাই করতে গেল শোভা। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢোকার জন্যে

পা বাড়াল। তারপর চোখ পড়ল চৌকির ওপর। বিছানায় শওকতের মাথাটা পড়ে রয়েছে, দেহ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। শোভার হাত থেকে ভাতের বাসন আর পানির গ্লাস পড়ে গেল। তার আর্তচিৎকার শুনে জেগে উঠল গোটা বস্তি।

খবর পেয়ে ইন্সপেক্টর মিনহাজের সঙ্গে বস্তিতে চলে এল শহীদ ও কামাল। সরকারী ডাক্তার লাশ পরীক্ষা করে জানালেন, প্রথমে শওকতকে ছুরি মারা হয়েছে, জবাই করা হয়েছে সে জ্ঞান হারাবার পর। অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে চওড়া ফলার কোন ছোরা। অত্যন্ত ধারাল ছিল সেটা, মাত্র দুই কোপে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে মাথাটা।

'ছুরি মেরে খুন করলেই তো পারত, মাথাটা কাটল কেন?' জিজ্ঞেস করলেন ইন্সপেক্টর।

'খুনী উন্মাদ।' প্রশ্নের উত্তরে ডাক্তার আরও জানালেন, তাঁর ধারণা, রাত আটটার দিকে খুনটা করা হয়েছে।

পুলিসের একটা ভ্যান এসে লাশটা মর্গে নিয়ে গেল। শোভার জ্ঞান ফেরেনি, কাজেই তাকে জেরা করা সম্ভব হলো না। বস্তিবাসীদের অনেককে জেরা করলেন ইন্সপেক্টর। কিন্তু না, কেউ কোন চিৎকার বা ধস্তাধস্তির আওয়াজ শোনেনি। লাশ মর্গে পাঠাবার পর ফরেনসিক ডিপার্টমেন্টের দু'জন বিশেষজ্ঞ শওকতের কামরাটা সার্চ করল। তার ব্যাগে দুটো চিঠি পাওয়া গেল–দুটোই বাংলায় টাইপ করা। প্রথম এনভেলাপে মিসেস হায়দার আলির নাম ও ঠিকানা লেখা রয়েছে। চিঠিতে লেখা হয়েছে–'মিসেস আলি, আপনি কি জানেন আপনার স্বামীর সঙ্গে নেসার আহমেদের মেয়ে তসলিমার অবৈধ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে? আমি একজন ধার্মিক মানুষ, তাই এ-ধরনের অসামাজিক কাজ

পছন্দ করি না।'

দ্বিতীয় এনভেলাপে নেসার আহমেদের নাম-ঠিকানা লেখা হয়েছে। চিঠির বক্তব্য প্রায় একই রকম–'আপনার মেয়েকে জিজ্ঞেস করুন, শ্যামলি যেদিন খুন হলো সেদিন বিকেল থেকে রাত আটটা পর্যন্ত বাড়িতে তার সঙ্গে কে ছিল।'

শহীদ বলল, 'বোঝাই যাচ্ছে, হায়দার আর তসলিমাকে ব্ল্যাকমেইল করতে চাইছিল শওকত।'

'তারমানে শওকত হত্যাকাণ্ডের একটা মোটিভ পাচ্ছি আমরা,' বললেন ইন্সপেক্টর।

মাথা নাড়ল শহীদ। 'ওরা অন্যায় ভাবে মেলামেশা করছিল ঠিকই, কিন্তু মানুষ খুন করা ওদের পক্ষে সম্ভব নয়।'

ইন্সপেক্টরকে অসন্তুষ্ট দেখাল। তবে শহীদের সঙ্গে তিনি তর্ক করতে উৎসাহী হলেন না। কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করার জন্যে তাড়াতাড়ি থানায় ফিরে এলেন তিনি।

শাকুর অ্যান্ড সন্সের শাকুর সাহেব ফোন করে শহীদকে অফিসে পাননি, তাই থানায় ফোন করেছেন তিনি। ইন্সপেক্টর মিনহাজ রিসিভার তুললেন। 'ইন্সপেক্টর সাহেব, জ্যাকেটের বোতাম নিয়ে কি কাণ্ড ঘটছে, আশা করি সবই আপনি শহীদ সাহেবের মুখে শুনেছেন। আমার দোকানে আরেক অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে।'

'কি অদ্ভুত ঘটনা?'

'আমার একটা জ্যাকেট থেকে বোতাম চুরি গেছে...'

'কি বলছেন? ক'টা?'

'একটা...'

'চুরি গেছে কিভাবে বুঝলেন?' জানতে চাইলেন ইন্সপেক্টর।

'পড়েও তো যেতে পারে।'

'আরে না! ব্লেড দিয়ে সুতো কেটে নিয়ে গেছে কেউ!'

'অসংখ্য ধন্যবাদ,' বলে রিসিভার রেখে দিলেন ইন্সপেক্টর। তারপর তিনি টেলিফোনে পুলিস ল্যাব-এর সঙ্গে যোগাযোগ করলেন।

ল্যাব থেকে জানানো হলো, শাকুর অ্যান্ড সন্সের প্রতিটি বোতামে শাকুর নামটা খোদাই করা আছে, সেই সঙ্গে উল্টোপিঠে খোদাই করা আছে সিরিয়াল নম্বর। হায়দার আলির জ্যাকেটের নম্বর একুশ দিয়ে শুরু। জ্যাকেটে সব মিলিয়ে ছ'টা বোতাম রয়েছে। একুশ থেকে ছাব্বিশ পর্যন্ত। অতিরিক্ত বোতাম দুটোর নম্বর হওয়া চাই সাতাশ আর আটাশ। সাতাশ নম্বর বোতামটা রয়েছে, কিন্তু অতিরিক্ত দ্বিতীয় বোতামটার নম্বর বাহান্ন। অর্থাৎ সিরিয়াল নম্বর মিলছে না।

ইন্সপেক্টর ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্টকে বললেন, 'তারমানে শাকুর অ্যান্ড সন্স থেকে হায়দার আলি বোতামটা চুরি করেছে?'

'তা আমি জানি না,' উত্তর দিল অ্যাসিস্ট্যান্ট। 'তবে আরও একটা তথ্য আছে আমার কাছে। লাশের কাছে যে বোতামটা পাওয়া গেছে, সেটার সিরিয়াল শুরু হয়েছে ০১ দিয়ে। অর্থাৎ ওই বোতামটা হায়দার আলির জ্যাকেট থেকে আসেনি।'

মাথাটা চক্কর দিতে শুরু করল ইন্সপেক্টরের। এই ধাঁধার সমাধান করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় বলে মনে হলো।

অ্যান্টিক ডিলার ও আর্ট গ্যালারির মালিক গাউস বখতের বয়েস ষাটের কাছাকাছি। চুল আর দাড়িতে মেহদি ব্যবহার করেন ভদ্রলোক, ঠোঁটে গায়ের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে লিপস্টিকের পরশও বুলান। কাঠামোটা ডলফিনের মত, নাদুসনুদুস আর থলথলে। এলিফেন্ট রোডে তিনটে কামরা নিয়ে তাঁর 'অ্যান্টিকস অ্যান্ড আর্ট গ্যালারি'। প্রাচীন জিনিস-পত্র, হাতে আঁকা ছবি, ছবি আঁকার সরঞ্জাম ইত্যাদি বিক্রি হয় এখানে। ভেতরের অফিস কামরায় বসে ক্রেতাদের একটা তালিকায় চোখ বুলাচ্ছেন এই মুহূর্তে, তাদের অনেকেই বেঁচে আছেন, কেউ কেউ মারা গেছেন। দেশের ধনী লোকজনই তাঁর ক্রেতা; এদেরকে নিয়ে সমস্যা হলো, সবারই বয়েস বেশি, যখন-তখন যে-কেউ মারা গিয়ে তাঁর দোকানের বেচা-বিক্রি কমিয়ে দেন! খদ্দেররা কেউ মারা গেলে শোক হয় কিনা বলা কঠিন, তবে বোধগম্য কারণেই দুঃখ পান তিনি। তালিকায় শফিকুর রহমানের নাম রয়েছে, দেখে পুরানো দুঃখটা নতুন করে অনুভব করলেন গাউস বখত। শফিকুর রহমান তাঁর অত্যন্ত প্রিয় একজন খদ্দের ছিলেন। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। চুরি করে বিদেশ থেকে আনা, এই কথা বলে শফিকুর রহমানকে পিকাসোর একটা ছবি বিক্রি করেছিলেন তিনি। 'এটা সত্যি

পিকাসোর আঁকা কিনা সন্দেহ আছে,' এ-কথা বলেই ছবিটা বিক্রি করা হয়েছিল। সব জেনেই সেটা কিনেছিলেন শফিকুর রহমান। ছবিটা আসল হলে দাম পড়ত বিশ লাখ টাকা। মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকা লাভ রেখে এক লাখ টাকায় সেটা বিক্রি করেছিলেন গাউস বখত। শফিকুর রহমান মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যাবার পর ভাল একজন খদ্দেরকে তিনি হারিয়েছেন।

দোকান থেকে পিছনের দরজা দিয়ে অফিসে ঢুকল আরিফুল হক। তাঁর এই কর্মচারিটি ছিপছিপে রোগা, বয়েস আন্দাজ করা প্রায় অসম্ভব–পঁচিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে হলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সোজা হেঁটে এসে ডেস্কের ওপর ঝুঁকল সে, চাপা গলায় বলল, 'স্যার, আন্দাজ করতে পারেন দোকানে কে এসেছেন? নজিবুর রহমান! অয়েল পেইন্টিং কিনছেন তিনি। সালাম বেগ এটা-সেটা অনেক কিছু গচাচ্ছেন। আপনি শুনে খুশি হবেন, তাই বলতে এলাম।'

চেয়ার ছেড়ে দ্রুত দোকানে চলে এলেন গাউস বখত। 'মি. নজিবুর রহমান! একেই বলে নিয়তি! বিশ্বাস করুন, অফিসে বসে এতক্ষণ আপনার আব্বার কথাই ভাবছিলাম!' শফিকুর রহমানের ছেলেকে খুঁটিয়ে লক্ষ করছেন তিনি। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। মুখটা ম্লান, চামড়ায় কালচে দাগ। কপালটা অস্বাভাবিক চওড়া, অথচ নাকটা ছোট, তবে খাড়া। চোখ দুটো চকচক করছে। নজিবুর রহমানের ডান কানে ছোট্ট একটা সোনার রিঙ ঝুলছে। 'আমি গাউস বখত, আপনার আব্বা আমার অত্যন্ত প্রিয় খদ্দের ছিলেন। প্রশংসা করছি না, কথাটা সত্যি–উঁচুদরের সমঝদার ছিলেন তিনি। দামী কোন অ্যান্টিক বা ভাল কোন ছবি দেখলেই চিনতে পারতেন। তো, আপনি আমার দোকানে এসেছেন, এ সত্যি আমার সৌভাগ্য!'

'এসেছিলাম রঙ কিনতে, কিন্তু আপনার কর্মচারী কয়েকটা পেইন্টিং গছিয়ে দিল,' বলল নজিবুর। 'অনুরোধে ঢেঁকি গেলা। এ-সব ছবি আমার পছন্দ নয়।'

'পছন্দ না হলে কেন কিনবেন আপনি!' গাউস বখত বললেন। 'আপনি বরং আমাদের দ্বিতীয় শো-রুমে চলুন, ওখানে আরও অনেক ছবি আছে–দু'একটা হয়তো পছন্দ হবে।'

'আমি নিজে ছবি আঁকি তো, তাই প্রভাবিত হবার ভয়ে অন্য কোন শিল্পীর ছবি বাড়িতে রাখি না,' বলল নজিবুর। 'নতুন কিছু দেখার কোন ইচ্ছে আমার নেই। যেগুলো কিনলাম, ওগুলো আমার বিভিন্ন অফিসে রাখা হবে, সে-সব অফিসে সাধারণত আমি যাই না।'

'ঢাকায় আমার গ্যালারির সুনাম আছে, মি. নজিবুর,' বললেন গাউস বখত। 'আপনার দু'একটা ছবি যদি পেতাম, সামনের শো-কেসে সাজালে সবার চোখে পড়ত। প্লীজ, মি. নজিবুর!'

শরীরে একটা উত্তেজনার ঢেউ খেলে গেল, তবে মাথা নেড়ে বলল নজিবুর, 'আমার ছবি স্পেশাল। খুব কম লোকেরই তা পছন্দ হবে। তাছাড়া, আমি নিজের জন্যে আঁকি, বিক্রির জন্যে বা কারও প্রশংসা পাবার জন্যে নয়।'

গাউস বখতের আগ্রহ আরও বেড়ে গেল। নজিবুর বিরল প্রতিভাদের ভাষায় কথা বলছে। 'প্লীজ, মি. নজিবুর, আমাকে হতাশ করবেন না। দেশে বোদ্ধাদের অভাব নেই। তাঁরা আপনার ছবি দেখে মতামত দিলে আমরা সবাই উপকৃত হব। নিজের ছবি সম্পর্কে আপনার যে বক্তব্য, তা থেকেই বোঝা যায় আপনি আর দশজন শিল্পীর চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। আপনাকে চেনার সুযোগ দেয়া উচিত মানুষকে। প্লীজ, মি. নজিবুর।'

তারপরও ইতস্তত করছে নজিবুর। 'আসলে, আমার শিল্পকর্ম বোঝার মত মানসিক প্রস্তুতি দেশের মানুষের আছে বলে আমি মনে করি না। পরে হয়তো ভেবে দেখা যেতে পারে।'

'আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি,' গদগদ হয়ে বললেন গাউস বখত। 'কিন্তু মানসিক প্রস্তুতি আছে কিনা সেটাও তো যাচাই হওয়া দরকার। আপনি দয়া করে অন্তত একটা ছবি দিন আমাকে...'

দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে রাজি হয়ে গেল নজিবুর। 'এত করে যখন বলছেন, ঠিক আছে, একটা ছবি পাঠিয়ে দেব আপনার দোকানে। তবে শর্ত আছে।'

'আমি আপনার যে-কোন শর্ত মেনে নেব!'

'কাউকে বলা চলবে না ছবিটা কার আঁকা। কেউ প্রশ্ন করলে বলবেন, শিল্পীর পরিচয় জানা যায়নি। ঠিক আছে?' নজিবুর এমন ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল, গলাটা কেমন শুকিয়ে এল গাউস বখতের।

মাথা ঝাঁকিয়ে তিনি বললেন, 'ঠিক আছে।'

'বিলটা বাড়িতে পাঠিয়ে দেবেন,' বলল নজিবুর। 'জিনিসগুলো গাড়িতে তুলে দিতে বলুন।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই!'

দোকান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে নজিবুর, হঠাৎ ছোট একটা শো-কেসের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। কেসটার ভেতর একটা আইটেম তার দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছে। 'কি এটা?' জিনিসটা চার ইঞ্চি লম্বা, রূপোর তৈরি, আকৃতি দেখে মনে হলো একটা ড্যাগার, সূক্ষ্মভাবে এনগ্রেভ করা, গায়ে রুবি আর এমারেল্ড বসানো।

প্রায় ছুটে তার পাশে চলে এলেন গাউস বখত। 'এটা একটা পেনডান্ট, মি. নজিবুর। ঠিক এই রকম দেখতে একটা পেনডান্ট গলায় ঝোলাতেন সোলায়মান দা গ্রেট। এটাই সেটা কিনা আমি বলতে পারব না, তবে পেনডান্টটা সোলায়মান দা গ্রেট রক্ষাকবচ হিসেবে ব্যবহার করতেন বলে শোনা যায়। এটাই সম্ভবত পৃথিবীর প্রথম সুইচ ব্লেড নাইফ, মি. নজিবুর।'

চোখ সরু করল নজিবুর। 'সুইচ ব্লেড নাইফ?'

মখমলের ওপর থেকে পেনডান্টটা হাতে নিলেন গাউস বখত। 'আসলটা সোলায়মান পরতেন পনেরোশো চল্লিশ সালে। বলা হয়, এই রক্ষাকবচ গলায় থাকাতেই আততায়ীর হামলা থেকে প্রাণে বেঁচে যান তিনি। খুবই রোমাঞ্চকর ব্যাপার!' ইঙ্গিত পেয়ে গাউস বখতের সামনে চলে এল আরিফ, গাউস বখত রক্ষাকবচটা তার গলায় পরিয়ে দিলেন। 'দেখছেন? ওর সরু গলায় কেমন মানিয়ে গেছে! আপনার গলায় আরও বেশি মানাবে, মি. নজিবুর।'

ড্যাগারটার ওপরের একটা রুবিতে চাপ দিল আরিফ, রুপোর কাঠামো থেকে চোখের নিমেষে বেরিয়ে এল সরু ছুরির ধারাল ফলা।

নজিবুরের চোখ দুটো আরও চকচকে হয়ে উঠল। 'এটার দাম কত?'

'অন্য কেউ হলে ত্রিশ হাজার টাকা চাইতাম,' সবিনয়ে বললেন গাউস বখত। 'কিন্তু আপনার আব্বা আমার প্রিয় খদ্দের ছিলেন, আপনার কাছ থেকে আমি পঁচিশ হাজারের বেশি চাইতে পারি না।'

'দিন ওটা,' বলে দোকান থেকে বেরিয়ে গেল নজিবুর।

*

তিনি গৃহবধূ, থাকেন লালমাটিয়ায়। খবরের কাগজে নীল একটা জ্যাকেটের ছবি ছাপা হয়েছে, খবরে বলা হয়েছে এই জ্যাকেট পরা একজন ম্যানিয়াক শহরে একের পর এক খুন করে বেড়াচ্ছে। শ্যামলি যেদিন খুন হয় সেদিন এই নীল রঙের জ্যাকেট পরা এক লোককে সন্ধের ঠিক আগে দেখেছেন তিনি, তাই থানায় ফোন করে ঘটনাটা জানাচ্ছেন।

ইন্সপেক্টর মিনহাজ জানতে চাইলেন, 'জ্যাকেট পরা লোকটাকে ঠিক কোথায় আপনি দেখেছেন?'

মহিলা মিষ্টি কেনার জন্যে আম্বালা সুইটস-এ ঢুকেছিলেন, সঙ্গে ছিল পোষা কুকুর। মিষ্টি কেনার সময় হঠাৎ তিনি খেয়াল করলেন কুকুরটা দোকানে নেই। ঘাড় ফিরিয়ে বাইরে তাকাতেই দেখতে পেলেন নীল জ্যাকেট পরা এক লোক দোকানটাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। পাশ থেকে এক পলকের জন্যে দেখেছেন, চেহারাটা চিনতে পারেননি, তবে কয়েকটা বৈশিষ্ট্য তাঁর চোখে ধরা পড়েছে। কি বৈশিষ্ট্য? এই যেমন, লোকটার বয়েস পঁচিশ-ছাব্বিশের বেশি হবে না। নাকের পাশে একটা বড় তিল আছে। সবচেয়ে আগে যেটা চোখে পড়েছিল, লোকটার ডান কানে ছোট একটা সোনার রিঙ আছে। লোকটার আরও একটা বৈশিষ্ট্য, হাতের আঙুলগুলো স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি লম্বা–যেন কোন শিল্পীর আঙুল।

'লোকটাকে আবার দেখলে আপনি চিনতে পারবেন?' জিজ্ঞেস করলেন ইন্সপেক্টর।

'পারব,' গৃহবধূ জানালেন।

তাঁর নাম-ঠিকানা চেয়ে নিয়ে যোগাযোগ কেটে দিলেন

ইন্সপেক্টর।

সন্ধ্যার স্থানীয় বিটিভির খবর শুনছেন নাফিসা বেগম, তাঁর পায়ের কাছে কার্পেটে বসে ঢুলছে খয়ের উদ্দিন। সংবাদপাঠক শওকত হত্যাকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে সবশেষে শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে সাবধান-বাণী উচ্চারণ করলেন, 'এ-ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে ম্যানিয়াক সিরিয়াল কিলার এই শহরেই কোথাও লুকিয়ে আছে। সবাইকে সাবধানে থাকতে হবে। খুনী ধরা না পড়া পর্যন্ত কেউ আমরা নিরাপদ নই। পুলিসের ব্যর্থতা জনমনে নানা প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছে...'

'এ আমি বিশ্বাস করি না! এ আমি কোনদিন বিশ্বাস করব না!' ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে উষ্মা প্রকাশ করলেন নাফিসা বেগম। 'নজিবুর এমন বীভৎস কাণ্ড কক্ষনো করতে পারে না...'

'আপনাকে এক কাপ কড়া কফি দিই, বেগম সাহেবা?' খয়েরউদ্দিন জিজ্ঞেস করল।

'দাও, দাও—হাত না কাঁপলে তাতে খানিকটা বিষও ঢেলে দিতে পারো!'

কিচেনে ঢুকে কফি বানাচ্ছে খয়েরউদ্দিন, জানালা দিয়ে দেখল গ্যারেজ থেকে মার্সিডিজ বের করে বাইরে বেরুচ্ছে নজিবুর, তার ছোট সাহেব। সে আন্দাজ করল, আজ আবার এলিফেন্ট রোডে যাচ্ছে নজিবুর, গাউস বখতের 'অ্যান্টিকস অ্যান্ড আর্ট গ্যালারি'-তে।

'ছোট সাহেব বেরিয়ে গেলেন, বেগম সাহেবা,' কফি নিয়ে ড্রইংরুমে ঢুকে নাফিসাকে বলল খয়েরউদ্দিন।

'ওর স্টুডিওতে যাও,' চাপা গলায় বললেন নাফিসা। 'দেখে এসো!'

তবে প্রথমে নিজের কামরায় ঢুকল খয়েরউদ্দিন, সামান্য আফিম খেলো দু'ঢোক কফির সঙ্গে। বিছানার তলায় লুকিয়ে রাখা চাবিটা নিয়ে সিঁড়ির কাছে চলে এল সে, লোহার গেট খুলে নজিবুরের রাজ্য দোতলায় উঠল।

ড্রইংরুমে বসে অপেক্ষা করছেন নাফিসা। মনে মনে তিনি জানেন, নজিবুর আরও একটা নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। তবে তাঁর ভুলও হতে পারে, মরিয়া হয়ে নিজেকে অভয় দেয়ার চেষ্টা করলেন। এবার রক্তমাখা কোন কাপড়চোপড় পাওয়া যায়নি বাড়ির কোথাও। বুকে হাত দিয়ে হৃৎপিণ্ডের লাফালাফি অনুভব করলেন। চোখ বুজে ভাবছেন, দ্বিতীয় খুনটাও নিশ্চয় নজিবুর করেছে। কি অপমান! কি অসম্মান! পরিচিত মহলে বড়াই করে তিনি বলে বেড়িয়েছেন, ছেলে তার পিকাসো যদি না-ও হয়, শিল্পাচার্যকে তো অবশ্যই টপকাবে। ওহ্, আল্লাহ! তাঁর সামাজিক জীবন ধ্বংস হয়ে যাবে। কে এমন একজন দানবের জন্মদাত্রীকে পার্টিতে ডাকবে? সমাজ তাঁর সেবাই বা কেন গ্রহণ করতে রাজি হবে? অথচ পার্টি আর সমাজসেবাই তাঁর জীবন! একবার সব জানাজানি হয়ে গেলে কেউ আর তাঁকে ডাকবে না!

খয়েরউদ্দিন ফিরে এল পা টিপে টিপে। কয়েক হাত দূরে দাঁড়াল সে। চোখাচোখি হলো। নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল খয়েরউদ্দিন।

'কি?' সামনের দিকে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলেন নাফিসা। 'মাথা ঝাঁকাচ্ছ কেন? কি দেখলে?'

'ছোট সাহেব একটা মানুষের মাথা আঁকছে, বেগম সাহেবা,' বলল খয়েরউদ্দিন, গলায় আওয়াজ ফুটতে চাইছে না। 'দেহ থেকে কাটা একটা মাথা, রক্ত ঝরছে।'

'রিলাক্সেন, খয়ের!'

খয়েরউদ্দিনের উর্দির পকেটেই রিলাক্সেন আছে, ট্যাবলেট আর এক গ্লাস পানি বাড়িয়ে ধরল সে।

ট্যাবলেট খেয়ে নাফিসা বললেন, 'খয়ের!'

'জ্বী, বেগম সাহেবা!'

'আমার সঙ্গে তুমি এ-বিষয়ে কথা বলবে না। কি বলছি বুঝতে পারছ? আমরা কিছু জানি না। কাজেই এ বিষয়ে আমরা কোন কথাও বলব না–এমনকি নিজেদের মধ্যেও না। যাও, নিজের কাজ করো গে।'

'ছোট সাহেব এই কাজ চালিয়ে যেতে পারেন, বেগম সাহেবা। বাধা না পেলে তিনি হয়তো থামবেন না।'

'ওরা কারা? মারা গেলে কি আসে যায়?' নাফিসার কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ। 'একটা বেশ্যা! একজন ছিনতাইকারী! কি আসে যায়?'

'কিন্তু, বেগম সাহেবা...'

'আমরা কিছু জানি না!' চেঁচিয়ে উঠলেন নাফিসা। 'তুমি তোমার এতদিনের পুরানো, এত আরামের চাকরিটা হারাতে চাও? তুমি চাও, লোকজনকে মুখ দেখানো বন্ধ করতে হয় আমাকে? এটা আমাদের নাক গলানোর কোন ব্যাপার নয়। আমরা কিছুই জানি না!'

বুড়ো বয়েসে চাকরি হারালে আফিম কেনার পয়সা পাব কোথায়? চিন্তা করল খয়েরউদ্দিন। এক সেকেন্ড ইতস্তত করে সে বলল, 'বেগম সাহেবা, ছোট সাহেব একটা বিপদ হয়ে উঠেছেন। তিনি আপনাকেও ধরতে পারেন।' নজিবুর যে তাকেও ধরতে পারে, এ-কথাটা আর বলল না।

'আমাকে ধরবে? আমি ওর মা! আমাকে ভয় দেখিয়ো না,

খয়ের। যাও, নিজের কাজ করো গে। আমরা কিছু জানি না!'

কাল মহুয়ার জন্মদিন, কিছু একটা কেনা দরকার। অফিসে কামালকে রেখে বেরুতে যাবে শহীদ, ইন্সপেক্টর মিনহাজ হোসেন ভেতরে ঢুকলেন। এ-কথা সে-কথার পর শহীদকে তিনি বললেন, 'মি. শহীদ, আপনি কি চান চাকরিটা আমি হারাই? ওপর মহল থেকে প্রচণ্ড চাপ আসছে। যদি থাকে, দু'একটা সূত্র দিন না!'

'ক্লু থাকলে দিতাম না, এ-কথা আপনি ভাবতে পারলেন?' বলল শহীদ। 'খুনীকে ধরার জন্যে আমরা কি কম চেষ্টা করছি।' হঠাৎ হেসে উঠল ও।

ইন্সপেক্টর অবাক। 'হাসছেন কেন?'

'একটা ক্লু আমার কাছে আছে বটে,' হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠল শহীদ। 'দিতেও পারি, কিন্তু ক্লুটার তাৎপর্য জিজ্ঞেস করবেন না–কারণ, আমারই জানা নেই। কোত্থেকে পেয়েছি তা-ও বলা সম্ভব নয়।'

চেয়ারে নড়েচড়ে বসলেন ইন্সপেক্টর। 'বলুন, প্লীজ। আমি কোন প্রশ্ন করব না।'

'রক্তলাল চাঁদ, কালো আকাশ, কমলা রঙের সৈকত,' বলল শহীদ।

হাঁ করে তাকিয়ে থাকল ইন্সপেক্টর। কিছু বলতে যাবে, বাধা দিল শহীদ।

'কোন প্রশ্ন করবেন না, আপনি কথা দিয়েছেন,' বলে উঠে পড়ল ও।

'কোথায় যাচ্ছেন। আপনার সঙ্গে কেসটা নিয়ে আলোচনা করতে এলাম...'

'আমাকে এলিফেন্ট রোডে যেতে হচ্ছে, কাল স্ত্রীর জন্মদিন, কিছু একটা কিনতে হবে।'

'চলুন, আমিও আপনার সঙ্গে যাই। আমারও কিছু কেনাকাটা আছে। এই সুযোগে আলোচনাও করা যাবে।'

জীপটা থানায় পাঠিয়ে দিয়ে শহীদের টয়োটায় চড়ে বসলেন ইন্সপেক্টর।

শনিবার বিকেল হলেও, এলিফেন্ট রোডের বেশিরভাগ দোকানই খোলা। ঘন ঘন হরতাল হওয়ায় এমনিতেও ব্যবসায়ীরা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ছুটির দিন দোকান-পাট খোলা রাখবে তারা। ফুটপাথের পাশে গাড়ি থামিয়ে নিচে নামল শহীদ, পাশে ইন্সপেক্টরকে নিয়ে সারি সারি দোকানের শো-কেসে চোখ বুলিয়ে হাঁটছে। 'অ্যান্টিকস অ্যান্ড গ্যালারি'-র সামনে আসতেই শো-কেসে রাখা ছবিটার ওপর চোখ পড়ল ওদের। দু'জনেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

রক্তলাল চাঁদ।

কালো আকাশ।

কমলা সৈকত।

হাত দিয়ে চোখ রগড়ে শহীদের বাহু খামচে ধরলেন ইন্সপেক্টর। 'কনফার্ম করুন, প্লীজ, আমি হ্যালুসিনেশনের শিকার না তো?'

'না, আপনি ভুল কিছু দেখছেন না।' শহীদও হতভম্ব হয়ে গেছে। টেলিপ্যাথীর এত শক্তি? ভাবছে ও। ধ্যানে বসে ক্লু পাওয়া, এ-ও কি সম্ভব?

আর ইন্সপেক্টর ভাবছে লালমাটিয়ার গৃহবধূর কথা। তিনি জানিয়েছেন, নীল জ্যাকেট পরা লোকটার হাতের আঙুল

স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি লম্বা–যেন একজন শিল্পীর আঙুল।

একটা ক্লু নামকরা প্রাইভেট ডিটেকটিভ শহীদ খান দিলেন। একটা ক্লু দিয়েছেন একজন গৃহবধূ। শো-কেসে সাজানো ছবিটা একজন শিল্পীর আঁকা! রক্তলাল চাঁদ, কালো আকাশ, কমলা সৈকত!

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে শহীদের পিছু নিয়ে দোকানটার ভেতর ঢুকে পড়লেন ইন্সপেক্টর।

সাত

দোকানের কর্মচারী আরিফ আর সালাম মালিক গাউস বখতের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিল।

আরিফ বলল, 'ছবিটা শো-কেসে রাখা উচিত হয়নি, স্যার!'

গাউস বখত বললেন, 'কেন এ-কথা বলছ? আমার দৃষ্টিতে ওটা অত্যন্ত উন্নতমানের একটা শিল্প কর্ম।'

আরিফকে সমর্থন করে সালাম বলল, 'উন্নতমানের শিল্প কর্ম? কি যেন বলেন, স্যার! শফিকুর রহমানের ছেলের আঁকা, তাই আপনি তাঁর বিরুদ্ধে কিছু বলতে চাইছেন না। ছবিটা আসলে শিল্পের কলঙ্ক, আমাদের দোকানের জন্যেও একটা অপমান।'

'চুপ! পুলিস!' ফিসফিস করলেন গাউস বখত। দরজার দিকে এগিয়ে এলেন তিনি। 'আরে, মি. শহীদ খান যে! কি সৌভাগ্য

আমার। আপনার মত স্বনামধন্য ব্যক্তি আমার দোকানে পায়ের ধুলো দেবেন, এ আমি ভাবতেই পারি না। সঙ্গে দেখছি ইন্সপেক্টর মিনহাজ সাহেবও আছেন। সত্যি আমি কৃতজ্ঞ। আসুন, স্যার, বসুন। আরিফ, ঠাণ্ডা দাও!'

একটা হাত তুলে আরিফকে থামিয়ে দিল শহীদ, তারপর গাউস বখতকে বলল, 'বাইরের শো-কেসটা, বখত সাহেব।'

'আপনি সত্যি গুণী ব্যক্তি!' গাউস বখতের চেহারা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। 'এরকম একটা আনকমন ছবি আপনার বেডরুমের দেয়ালে দারুণ মানাবে। আপনার রুচির প্রশংসা করতে হয়...'

'ওটা আমি কিনব না, এমন কি বিনা পয়সায় দিলেও নেব না,' বলল শহীদ। 'আমি জানতে চাইছি, ওটা এঁকেছে কে?'

'কিনবেন না!'

'না। জানতে চাইছি, শিল্পী পরিচয় কি? কে সে?' জিজ্ঞেস করল শহীদ। 'বখত সাহেব, আমরা একটা মার্ডার কেস ইনভেস্টিগেট করছি।'

বোবা হয়ে গেলেন গাউস বখত। বাকশক্তি ফিরে পেতে কয়েক মুহূর্ত সময় নিলেন। 'ও, আচ্ছা, মার্ডার কেস! কে এঁকেছে? সেরেছে! আপনি আমাকে একটা সমস্যায় ফেলে দিলেন, মি. শহীদ। কে এঁকেছে তা তো আমি জানি না।'

'জানেন না মানে?'

'একজন আর্টিস্ট বিক্রি করার জন্যে রেখে গেছে, কিন্তু সে নিজের পরিচয় বা ঠিকানা দিয়ে যায়নি। বলে গেছে, মাঝে মধ্যে এসে খবর নিয়ে যাবে বিক্রি হলো কিনা।'

'কবে রেখে গেছে?'

'কয়েক হপ্তা আগে। সঠিক দিনটা মনে নেই। আরিফ,

তোমার মনে আছে?'

মাথা নাড়ল আরিফ।

ইন্সপেক্টর মিনহাজ প্রশ্ন করলেন, 'আর্টিস্ট দেখতে কেমন? তার চেহারার বর্ণনা দিন।'

'আমি তাকে দেখিনি,' জবাব দিলেন গাউস বখত। 'তোমার মনে আছে, সালাম?'

'আমিও তখন দোকানে ছিলাম না,' বলল সালাম। 'আমাদের অন্য একজন কর্মচারী ছিল, সে এখন ছুটি নিয়ে দেশের বাড়িতে।'

ইন্সপেক্টর ও শহীদ দৃষ্টি বিনিময় করল। দু'জনেই বুঝতে পারছে, মালিক বা কর্মচারীরা সত্যি কথা বলছে না, কি যেন গোপন করছে। 'আমরা একটা মার্ডার কেস তদন্ত করছি, মি. বখত,' বলল ইন্সপেক্টর। 'আমাদের বিশ্বাস করার কারণ আছে, এই ছবিটা যে এঁকেছে তার সঙ্গে শ্যামলি ও শওকত হত্যাকাণ্ডের সম্পর্ক আছে। ওদের কথা আপনাকে আশা করি নতুন করে কিছু বলতে হবে না।'

গাউস বখতের হার্ট একটা বিট মিস করল। তবে চেহারাটা তিনি নির্লিপ্ত রাখতে পারলেন। ভুরু উঁচু করে বললেন, 'তা কিভাবে সম্ভব!'

'কিভাবে সম্ভব আপনার তা জানার দরকার নেই,' বললেন ইন্সপেক্টর। 'এই লোকের চেহারার বর্ণনা চাই আমি। আমরা একজন সিরিয়াল কিলারকে খুঁজছি।'

নজিবুর রহমানের কথা ভাবছেন গাউস বখত। ভদ্রলোকের কাছে প্রায় সত্তর হাজার টাকা পাওনা রয়েছে তাঁর! 'আমি আমার স্টাফকে জিজ্ঞেস করব, ইন্সপেক্টর সাহেব। দু'একদিনের মধ্যে কাজে ফিরে আসবে সে।'

'আমরা যাকে খুঁজছি তার চেহারার বর্ণনা এরকম–খুব একটা লম্বা নয়, হাতের আঙুল বেশ লম্বা, ডান কানে সোনার রিঙ পরে। তাকে নীল জ্যাকেট পরা অবস্থায় দেখা গেছে, জ্যাকেটের বোতামগুলো ছিল চকচকে তামার। তার নাকের পাশে বড় একটা তিল আছে।'

শহীদ বুঝতে পারল, ইন্সপেক্টর অন্য কোন উৎস থেকে নতুন সূত্র পেয়েছেন, অথচ ওকে জানাননি।

গাউস বখতের মাথার ভেতর গুরুগুরু মেঘ ডাকতে শুরু করেছে। তার শিউরে ওঠাটা লক্ষ করল শহীদ ও ইন্সপেক্টর।

শহীদ বলল, 'আপনাকে শেষবারের মত জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, এই ছবির শিল্পীকে আপনি চেনেন কিনা?'

গাউস বখত ইতস্তত করছেন। নজিবুর রহমান কি খুনী হতে পারে? মানুষ চেনা দায়, হতেও পারে! কিন্তু তার দেয়া তথ্য পেয়ে পুলিস যদি নজিবুরকে গ্রেফতার করে, সত্তর হাজার টাকার আশা ত্যাগ করতে হবে! টাকাটা স্রেফ কর্পূরের মত উবে যাবে! 'ব্যাপারটা কতটুকু সিরিয়াস আমার কোন ধারণা নেই,' মাথা নেড়ে বললেন তিনি। 'তবে আমার কথার নড়চড় হবে না। সোমবারে আমার কর্মচারী ফিরে এলে আমি নিজে তাকে জিজ্ঞেস করব। সবচেয়ে ভাল হয়, সোমবার সকালে আপনারা যদি কষ্ট করে আরেকবার আসেন। তাহলে আপনারাই তাকে প্রশ্ন করে জেনে নিতে পারবেন।'

শহীদ বলল, 'ঠিক আছে। তবে একটা কথা। এই খুনীকে কেউ যদি রক্ষা করার চেষ্টা করে, জোড়া খুনের সহায়তাকারী হিসেবে অভিযুক্ত করা হবে তাকে। কথাটা আপনাকে মনে রাখতে বলি। সোমবার সকালে আমরা আসব।' দোকান থেকে বেরিয়ে

এল ও, পিছু নিয়ে ইন্সপেক্টর মিনহাজও।

দোকান থেকে ওরা বেরিয়ে যেতেই সালাম বেগ চাপা স্বরে বলল, 'কাজটা স্যার আপনি ভাল করলেন না! শেষ পর্যন্ত না আমরাও ফেঁসে যাই!'

'ভাল করিনি?' রেগে গেলেন গাউস বখত। 'নজিবুরের নাম বললে পুলিস যদি তাকে গ্রেফতার করে, আমাদের সত্তর হাজার টাকা আর কোনদিন পাব?'

'আপনার যা ভাল মনে হয় করুন,' বলল আরিফ। 'তবে আমাদেরকে জড়াবেন না! খুনীকে সাহায্য করার অভিযোগে জেল খাটতে রাজি নই আমরা!'

কথাটা পুরানো হলেও, সব সময় সত্যি নয়–খুনী অকুস্থলে আবার ফিরে আসে। এক্ষেত্রে অকুস্থল বলতে কল্যাণপুর বস্তি এলাকাকে বুঝতে হবে। এই এলাকায় দু'দুটো খুন করেছে নজিবুর, স্বাভাবিক কারণেই এদিকে তার পা মাড়ানোর কথা নয়। তবু সে এল। তবে একা আসেনি। খবরের কাগজে তসলিমার ছবি ছাপা হয়েছে, লেখা হয়েছে সে তার বাড়িতে একা থাকে। চাকর-চাকরানী আছে, তবে সন্ধের আগেই তারা চলে যায়। এই রিপোর্ট পড়েই তসলিমা সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠে সে।

পাঁচটা বাজতে না বাজতেই টেবিলের কাজ শেষ করে অফিস কামরায় পায়চারি শুরু করল তসলিমা। হায়দার খুলনায় চলে যাবার পর থেকে তার ওপর দিয়ে খুব ধকল যাচ্ছে। আজও সারাদিন টেবিল ছেড়ে ওঠার সময় পায়নি সে।

কাজ এক অর্থে তার জন্যে খুব উপকারী। যতক্ষণ কাজের

মধ্যে থাকে, নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণাটা তেমন অনুভব করে না। কিন্তু কাজ শেষ হওয়া মাত্র মাথার ভেতর পোকা ঢোকে, মন আর শরীর দুটোই ছটফট করতে থাকে। নিজেকে সে প্রশ্ন করে, কোটিপতি বাবার মেয়ে আমি, অথচ আমাকে একা থাকতে হয় কেন? আমার মনে এত কেন অশান্তি? কেন আমি চুপি চুপি ফেন্সি কিনে খাই? কেন আমার ঘুম আসে না? সৎ মায়ের জ্বালায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছি, কেন বাবা আমাকে আদর করে ডেকে নিয়ে যায় না?

এ-সব প্রশ্ন মনে জাগলে অসহায় বোধটা আরও প্রবল হয়ে ওঠে তসলিমার। তখন সে একজন পুরুষের সান্নিধ্য খোঁজে। হায়দারের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ার সেটাই কারণ ছিল। হায়দারের সঙ্গে পরিচয় হবার পর অন্য কোন পুরুষ তার দরকার হয়নি। সে ঢাকায় থাকলে, তার সঙ্গ পাক না পাক, অন্য কোন সময় পাবার আশায় ধৈর্য ধরতে পারত সে। কিন্তু হায়দার নাগালের বাইরে, কবে ফিরবে কোন ঠিক নেই, এই চিন্তাটা তাকে একই সঙ্গে হতাশ ও বেপরোয়া করে তুলল। তসলিমা সিদ্ধান্ত নিল, আজ রাতে একজনকে তার দরকার।

প্রথমে ফেন্সি কিনবে সে। তারপর বেরুবে পুরানো বন্ধুদের খোঁজে। পিয়নকে ছুটি দিল, দারোয়ানকে বলল অফিস বন্ধ করো। পিয়ন চলে গেছে। দারোয়ান অফিস কামরা পরিষ্কার করছে, এই সময় ওয়েটিং রুমে ঢুকল এক তরুণ।

তরুণকে দেখেই তসলিমার হার্টবিট বেড়ে গেল। অত্যন্ত দামী একটা স্যুট পরেছে। হাতে দুর্লভ রোলেক্স ঘড়ি। গলায় ঝুলছে অদ্ভুতদর্শন একটা পেনডান্ট। চেহারায় ঠাণ্ডা একটা ভাব, তবে দেখতে সুন্দর। একেই আমার দরকার, মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল তসলিমা। লক্ষ করল, কোন রকম ইতস্তত না করে অফিস

কামরায় ঢুকে পড়ল সে, ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ রহস্যময় হাসি, চোখে ঠাণ্ডা দৃষ্টি। তরুণের ডান কানে একটা রিঙ ঝুলছে।

'অফিস বন্ধ হয়ে গেছে,' বলল তসলিমা। 'তবু কষ্ট করে যখন এসেছেন, আপনার কথা শোনা যেতে পারে।'

দারোয়ান ভেতরের কামরায় চলে গেছে, অফিসে তসলিমা একা।

তরুণ বলল, 'আমি রিয়েল এস্টেটের ব্যবসা করি, কয়েকটা ফ্যাক্টরিও আছে আমার। নিজের জন্যে নয়, স্টাফের জন্যে বীমা করতে চাই–গ্রুপ বীমা। এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম আলাপ করে যাই।'

'ভালই করেছেন,' বলল তসলিমা। 'আমি আপনাকে প্রসপেক্টাস দিতে পারি, পড়লেই সমস্ত শর্ত ও প্রিমিয়াম-এর নিয়ম জানতে পারবেন।'

'আমি কল্যাণপুরের ভেতর দিকে থাকি,' মিথ্যে কথা বলল নজিবুর। 'এই পথ দিয়েই আসা-যাওয়া করি। সময় করে আরেক দিন তাহলে আসব, কেমন?' সবিনয়ে হাসল সে। 'কিছু মনে করবেন না, আপনাকে কষ্ট দিলাম।'

'না-না, আমি কিছু মনে করিনি, আপনি আমাকে কষ্টও দেননি,' তাড়াতাড়ি বলল তসলিমা। সে ভয় পাচ্ছে তরুণ না হাতছাড়া হয়ে যায়। 'কল্যাণপুরে থাকেন আপনি? তাহলে তো বলতে হবে আমরা প্রতিবেশী। আমিও তো ওদিকে থাকি।'

'তাই নাকি!' হাসল নজিবুর। 'বেশ ভালই হলো, আমরা তাহলে একসঙ্গে ফিরতে পারব। আমার সঙ্গে গাড়ি আছে।'

দু'জনই দু'জন সম্পর্কে ভাবছে, টোপ গিলেছে!

'কি আশ্চর্য!' হেসে উঠে বলল তসলিমা। 'আপনার নামটাই

তো আমার জানা হয়নি।'

'আমি নজিবুর রহমান,' মিটিমিটি হেসে বলল নজিবুর। 'আপনি?'

'আমি তমা, তসলিমার সংক্ষেপ আর কি।' রাস্তার দিকে তাকাল তসলিমা। 'আপনার গাড়িটা তো দেখছি না?'

'অনেক বড় গাড়ি তো, রাস্তার মোড়ে রেখে আসতে হয়েছে। অন্যান্য দিন ছোট গাড়ি নিয়ে বেরুই, বড় গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে আজ বিপদেই পড়েছি। ধন্যবাদ, আজ তাহলে আসি, কেমন?'

'কিন্তু আপনি না বললেন, একসঙ্গে ফিরতে পারি আমরা?' রীতিমত হতাশ দেখাল তসলিমাকে।

'ও, হ্যাঁ, তাই তো! ঠিক আছে, চলুন তাহলে যাওয়া যাক,' বলে অফিস থেকে বেরিয়ে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াল নজিবুর।

চিৎকার করে দারোয়ানকে ডাক দিল তসলিমা, বলল, 'আমি বেরিয়ে যাচ্ছি, তুমি অফিস বন্ধ করো।' দারোয়ান ভেতরের কামরা থেকে বেরুবার আগেই অফিস ছাড়ল সে, নজিবুরের সঙ্গে মোড়ের দিকে যাচ্ছে।

নজিবুরের মার্সিডিজটা দেখে তসলিমার চোখের মণি নেচে উঠল। গাড়িতে পাশাপাশি বসল ওরা। স্টার্ট দিয়ে নজিবুর বলল, 'জানেন, আমি খুব একা। সময়টা যে কিভাবে কাটাব, বুঝতে পারছি না।'

'একই সমস্যা তো আমারও,' সুযোগ পেয়ে কথাটা বলে ফেলল তসলিমা। 'আচ্ছা, আপনি কি বিখ্যাত ব্যবসায়ী শফিকুর রহমানের কেউ হন?'

'উনি আমার আব্বা, মারা গেছেন।'

'তাই বলুন! আপনার নামটা কেমন চেনা চেনা লাগছিল।

নিশ্চয়ই বাপ্পির মুখে শুনেছি। আমি নেসার আহমেদের মেয়ে, বীমা কোম্পানিটা আমাদেরই।'

'তারমানে আমরা একই ক্লাসের, তাই না?'

সমর্থনসূচক মাথা ঝাঁকিয়ে হাসল তসলিমা।

'দু'জনেই যখন একা, সময় কাটানোর সমস্যায় ভুগছি, কোথায় যাওয়া যেতে পারে ভাবুন তো,' বলল নজিবুর। 'আমার বাড়ি, নাকি আপনার বাড়ি?'

'আপনার বাড়িতে নিশ্চয়ই আরও লোকজন আছে,' বলল তসলিমা। 'আমার বাড়িতে আমি একা থাকি। ফিরে দেখব চাকরবাকররাও চলে গেছে।'

'কিন্তু এত বড় গাড়ি নিয়ে যাওয়া যাবে তো?'

তসলিমা ভাবল, গাড়িটা বাড়ি থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকলেই ভাল হয়। 'এক কাজ করলে হয়। মেইন রোডে বেরুই চলুন, একটা পেট্রল পাম্পে গাড়ি রেখে রিকশা নিয়ে যাই আমরা।'

আইডিয়াটা লুফে নিল নজিবুর। 'সেই ভাল।'

তসলিমা সন্ধ্যা সাতটার দিকে খুন হলো। পুলিস খবর পেল এক ঘণ্টা পর।

সকালে অফিসে যাবার সময় রুস্তম বেপারিকে দুশো টাকা দিয়েছিল তসলিমা, কথা হয়েছিল অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে দু'বোতল ফেন্সি নিয়ে যাবে। বোতল দুটো নিয়ে বসে আছে বেপারি, কিন্তু তসলিমা এল না। রাত সাতটার পর টেপিকে পাঠাল জয়তুনের খোঁজে। জয়তুন মধ্যবয়স্কা বিধবা, তসলিমার বাড়িতে ঠিকে ঝিয়ের কাজ করে। জয়তুন আসতে বেপারি তাকে

জিজ্ঞেস করল, 'তসলিমা অফিস'থন ফিরছে কিনা কইবার পারো?'

জয়তুন বলল, 'কাম সাইরা তিনটার সম ফিইরা আইছি, আফায় ফিরছেন কিনা কেমনে কমু!'

বেপারি সিদ্ধান্ত নিল, জয়তুনের হাতে ফেন্সি পাঠানো নিরাপদ নয়। সে একটা বুদ্ধি আঁটল। পকেট থেকে দুশো টাকা বের করে জয়তুনকে দিল, বলল, 'তোমার আফারে গিয়া কইবা ধারের ট্যাহা শোধ করলাম। কি কইবা?'

'কমু কর্জের ট্যাহা শোধ করলেন।'

মিনিট পনেরো পর কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এল জয়তুন। 'আফায় খুন হয়া গেছেন! আফায় খুন হয়া গেছেন!' রুস্তম বেপারির ঘরের সামনে উঠানে বসে নিজের কপাল চাপড়াতে লাগল সে।

বস্তির কয়েকজন লোককে নিয়ে তখনি থানার উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল রুস্তম বেপারি।

চারটে রিলাক্সেন খেয়ে সন্ধে সাতটার দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন নাফিসা, ঘুম ভাঙল পরদিন সকাল সাড়ে ন'টায়। ঘুমের মধ্যে ভীতিকর একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছেন তিনি। তাঁর পরিচিত সব বন্ধু-বান্ধব কোথাও জড়ো হয়েছে, তাদের সঙ্গে তিনিও আছেন। কিন্তু কেউ তারা সরাসরি তার দিকে তাকাচ্ছে না। নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করছে সবাই, কথাগুলো তিনি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন। ওরা বলছে, 'ওর ছেলে একটা খুনী! ওই মহিলা একজন খুনীর মা! নজিবুর খুনী! ওই মহিলার ছেলে বদ্ধ একটা পাগল!'

দুঃস্বপ্নের মধ্যে তিনি নিজের মুখটা দু'হাতে ঢেকে

রেখেছিলেন। ঘুম ভাঙার পর অনুভব করলেন, সারা শরীর ঘামে ভিজে গেছে। বিছানার পাশে বোতাম আছে, সেটা টিপলেন। একটু পরই দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল খয়েরউদ্দিন।

'খয়ের! তাড়াতাড়ি আমাকে এক কাপ কপি দাও!'

'বেগম সাহেবা, কাল রাতে আপনি কিছু খাননি–ব্রেকফাস্ট দিই?'

'না! ও কোথায়?'

'দোতলায়, বেগম সাহেবা।'

'কাল রাতে কখন সে ফেরে?'

'ন'টার দিকে, বেগম সাহেবা।'

'যাও, কফি আনো। তার আগে খবরের কাগজটা দিয়ে যাও।'

'তাজা খবর-এর প্রথম পৃষ্ঠাতেই ছাপা হয়েছে রোমহর্ষক শিরোনামটা–' খুনী আবার আঘাত হেনেছে!'

খবরে বলা হয়েছে, 'এক হপ্তাও পার হয়নি, সিরিয়াল মার্ডারার তিন তিনটে খুন করল। তার সর্বশেষ শিকার বিখ্যাত ব্যবসায়ী নেসার আহমেদের মেয়ে তসলিমা আহমেদ। কল্যাণপুরের বাড়িতে তার ক্ষত বিক্ষত লাশ পাওয়া গেছে কাল রাত সাতটার কিছু পর। পুলিস বলছে, তারা নিশ্চিত, খুনীকে কেউ নিরাপদ আশ্রয়ে লুকিয়ে থাকতে সাহায্য করছে। নেসার আহমেদ মেয়েকে হারিয়ে পাগলের মত হয়ে গেছেন। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী ঘোষণা করেছেন, কেউ যদি এই সিরিয়াল কিলারকে ধরে নিতে পারে তাকে পাঁচ লাখ টাকা পুরস্কার দেয়া হবে। পুলিসের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, খুনী সম্পর্কে কেউ কোন তথ্য দিলে তার পরিচয় গোপন রাখা হবে। কয়েকটা ফোন নম্বর ছাপা হলো, যে-কেউ নিজের পরিচয় গোপন রেখেও এই নম্বরে ফোন করে তথ্য দিতে

পারেন। পরে, তার দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে খুনীকে গ্রেফতার করা সম্ভব হলে, পুরস্কারের টাকা নেয়ার জন্যে পুলিসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন তিনি...'

পাঁচ লাখ টাকা! নাফিসা ভাবছেন। খয়ের কি লোভটা সামলাতে পারবে?

কফি নিয়ে বেগম সাহেবার বেডরূমে ঢুকল খয়েরউদ্দিন। খবরটা সে আগেই পড়েছে। সে-ও ভাবছে, পাঁচ লাখ টাকা! বুড়ো বয়েসে কাজ করতে হবে না! টাকাটা ব্যাংকে রাখলেও মাসে মাসে যা আয় হবে, তা দিয়ে তার খাওয়া-পরা ও আফিম কেনা যাবে। তারপর, হঠাৎ সে লক্ষ করল, বেগম সাহেবা তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছেন।

'খয়ের!' নাফিসা সন্দেহ করছেন, বেঈমানী করার কথা ভাবছে লোকটা। 'আমাদের মুখ খোলা চলবে না! টাকাই সব নয়, কথাটা ভুলবে না। আমার কথা ভাবো! জীবনটা একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে। চিরকাল আমি তোমার আনুগত্যের ওপর নির্ভর করে এসেছি।'

চেহারায় কোন ভাব নেই, ভক্তি প্রকাশের জন্যে খয়েরউদ্দিন মাথা নোয়াল। মনে মনে ভাবছে, তুই বেটি শুধু নিজের স্বার্থের কথা ভাবিস। নিজের স্বার্থ আর ছেলের স্বার্থ! আমি যে সারাটা জীবন তোর চাকর হয়ে কাটিয়ে দিলাম, বিনিময়ে তুই বেটি আমাকে কি দিয়েছিস? আমি বিয়ে করলে, ছেলেপুলে হলে, বেতনের টাকায় আমার সংসার চলত? 'জ্বী, বেগম সাহেবা! আমাদের মুখ খোলা চলবে না।'

'নজিবুরের সঙ্গে আমি কথা বলব, খয়ের,' নরম সুরে বললেন নাফিসা। 'তোমার বেতন আরও অনেক বাড়িয়ে দেয়া দরকার।

আমার প্রতি অনুগত থাকো, কথা দিচ্ছি তোমাকে ঠকতে হবে না।'

'আপনার কফি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, বেগম সাহেবা।'

নাফিসা ভাবছেন, খয়েরকে কি বিশ্বাস করা যায়? সে ফিরে যাচ্ছে, পিছন থেকে তাকে ডাকলেন তিনি। 'খয়ের!'

'জ্বী, বেগম সাহেবা?' ঘুরল খয়েরউদ্দিন।

'আজ তোমার কাজ কি?'

'আপনার জন্যে লাঞ্চ তৈরি করব। আজ রবিবার, বাইরে একটু হাঁটতে যেতে পারি।'

'আমার শরীরটা আজ তেমন ভাল ঠেকছে না। কি রকম দুশ্চিন্তার মধ্যে আছি জানোই তো। একা থাকতে অসহ্য লাগবে আমার। তোমার আজ বাইরে না বেরুলে হয় না?'

'জ্বী, বেগম সাহেবা–আপনি বললে বেরুব না।' আরেকবার মাথা নত করে সম্মান দেখাল খয়েরউদ্দিন, তারপর কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

গ্যালারির ওপরতলায়, নিজের বিলাসবহুল ফ্ল্যাটে বসে খবরটা গাউস বখতও পড়লেন। তসলিমা খুন হওয়ায় তিনি খুব একটা বিস্মিত হননি। নেসার আহমেদের মেয়েটা অত্যন্ত ছটফটে টাইপের ছিল, মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও বেপরোয়া পুরুষের মত জীবনযাপন করত, তার এই পরিণতি স্বাভাবিক বলেই ধরে নিলেন তিনি। ভাবছেন পুরস্কারের টাকাটার কথা। পাঁচ লাখ টাকা তাঁর জন্যে খুব একটা বড় অঙ্ক নয়, কোন কোন মাসে এরচেয়ে বেশিও আয় করেন তিনি। তবু তাঁর লোভ হচ্ছে বৈকি। অনিচ্ছাসত্ত্বেও লোভটা তিনি দমন করলেন একাধিক কারণে। নজিবুর রহমান

খুনী, এর কোন নিরেট প্রমাণ তাঁর কাছে নেই। খুনগুলোর সঙ্গে নজিবুর রহমানের আঁকা ছবির সম্পর্ক আছে, পুলিসের এই সন্দেহ তার বোধগম্য হয়নি। ইন্সপেক্টরের দেয়া বর্ণনার সঙ্গে নজিবুর রহমানের চেহারার মিল আছে, তা ঠিক, কিন্তু শহরের আরও অসংখ্য তরুণের সঙ্গে এই বর্ণনা মিলে যাবে। বুকে কয়েকটা হালকা চাপড় মারলেন গাউস বখত, নাস্তা করতে বসে প্রচুর ঝাল দিয়ে রান্না করা মাংস খাওয়ায় বুকজ্বালা করছে। পুলিসকে নজিবুরের পরিচয় তিনি না হয় জানালেন, কিন্তু তারপর যদি নজিবুর প্রমাণ করতে পারে সে নির্দোষ? নির্দোষ প্রমাণিত হবার পর সে খোঁজ নেবে পুলিসকে কে তার পরিচয় জানিয়েছে। কথাটা শহরে রটে যাবে–গাউস বখত ক্রেতাদের গোপন তথ্য ফাঁস করে দেয়। তাতে তার ব্যবসার মারাত্মক ক্ষতি হবে। কারণ সমাজের ওপরমহলের লোকজন তার কাছ থেকে চোরাই মাল কেনেন, বিক্রিও করেন চোরাই মাল। তথ্য ফাঁসের কথা রটে গেলে কয়েকশো ক্রেতা আতঙ্কিত হয়ে উঠবেন। গাউস বখতের ব্যবসা লাটে উঠবে। পাঁচ লাখ টাকার লোভ করলে ব্যবসা হারিয়ে পথে বসতে হবে তাকে!

খবরটা নজিবুরও পড়ল। পাঁচ লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে! সর্বনাশ! মাথায় হাত দিয়ে চিন্তা করতে বসল সে। মেয়েটাকে খুন করাটা তার মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে।

কে কে জানে? শুধু তার মা আর খয়েরউদ্দিন। মা? মা'র কাছে সামাজিক মর্যাদাই সব কিছু। খয়েরউদ্দিন? হ্যাঁ, টাকার লোভে বুড়ো আফিমখোরটা বেঈমানী করবে।

নিজেকে তাগাদা দিল নজিবুর, দেরি করাটা বোকামি, তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নাও! সোলায়মানের পেনডান্টটা আঙুল দিয়ে

কয়েক মুহূর্ত নাড়াচাড়া করল সে, তারপর উঠে দাঁড়াল। বিড়ালের মত নিঃশব্দ পায়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামছে। গেটের কাছে থেমে কান পাতল। কিচেন থেকে বাসন-পেয়ালা ধোয়ার আওয়াজ ভেসে আসছে। গেট খুলে খয়েরউদ্দিনের কামরায় চলে এল সে। বাতাসে আফিমের মিষ্টি গন্ধ। প্রতিটি জানালায় লোহার গরাদ আছে। টেলিফোনের এক্সটেনশন লাইনটা কেটে দিল নজিবুর। দরজার কী-হোল থেকে বের করে চাবিটা পকেটে ভরল, তারপর বেরিয়ে এল করিডরে, দরজাটা বন্ধ করতে ভুলল না।

বোবা-কালা সামিনাও খবরটা পড়ল। কে খুন করেছে, কেন করেছে, তার কোন ধারণা নেই। পুরস্কারের টাকা নিয়ে সে মাথা ঘামাল না। নিজের ঘরে অপেক্ষা করছে, খয়েরউদ্দিন কাজ সেরে কিচেন থেকে বেরিয়ে এলেই ভেতরে ঢুকে খানিকটা চিকেন সুপ চুরি করে খাবে।

দরজার সরু ফাঁক দিয়ে নজিবুরকে দেখতে পেল সামিনা, খয়েরউদ্দিনের দরজার চাবি পকেটে ভরল। করিডর ধরে এগোচ্ছে নজিবুর, তারপর ছোট্ট স্টোররূমে ঢুকে পড়ল, দরজাটা সামান্য ফাঁক করে রেখেছে।

কয়েক মিনিট পর কিচেন থেকে বেরিয়ে নিজের কামরায় ঢুকল খয়েরউদ্দিন।

খয়েরউদ্দিন নিজের কামরায় ঢুকতেই স্টোররূম থেকে বেরিয়ে এল নজিবুর। বাইরে থেকে খয়েরউদ্দিনের দরজায় তালা লাগিয়ে দিল সে।

নিজের ঘর থেকে ঘটনা দেখে হাঁ হয়ে গেল সামিনা। তারপর দেখল, নজিবুর করিডর ধরে বেগম সাহেবার কামরার দিকে হেঁটে

যাচ্ছে।

ঘরে ঢুকে খানিকটা আফিম খেলো খয়েরউদ্দিন। পাঁচ লাখ টাকা! এই সুযোগ ছাড়া যায় না। পুলিসকে ফোন করবে সে। তার কাছে সমস্ত প্রমাণ আছে। স্টুডিওর বীভৎস ছবিগুলোও পুলিসকে দেখাবে সে। নজিবুরের কাপড়চোপড় পুড়িয়েছে সে ঠিকই, তবে ছাইগুলো ফেলে দেয়নি, লুকিয়ে রেখেছে। ছাইয়ের সঙ্গে হৃৎপিণ্ড আকৃতির তামার বোতামগুলোও আছে। পুলিসকে বললে, এখুনি। দেরি করলে সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে।

বিছানা ছেড়ে দাঁড়াল খয়েরউদ্দিন। টেলিফোনের গায়েই থানার নম্বর লেখা আছে। রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল সে। ডায়ালিং টোন না পেয়ে ভুরু কোঁচকাল। রিসিভার নামিয়ে রেখে পায়চারি শুরু করল। কিছুক্ষণ পর পর ডায়াল করছে। কোন লাভ হচ্ছে না।

তারপর লাইনটা কাটা দেখল সে। ঝুলন্ত তারটার দিকে বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। তারপর ছুটল দরজার দিকে। কিন্তু দরজা বাইরে থেকে বন্ধ।

নিজের বেডরূমে, দু'হাতে মুখ ঢেকে বিছানায় বসে আছেন নাফিসা। তসলিমা আহমেদ! নেসার আহমেদের মেয়ে! হায় খোদা, তসলিমাকে কেন মারতে গেল নজিবুর! একি পাগলামি! এ-কথা যদি ফাঁস হয়, তিনি একেবারে শেষ হয়ে যাবেন! নেসার আহমেদ অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির প্রতিশোধপরায়ণ মানুষ। ঢাকা শহর থেকে স্রেফ উৎখাত করবেন তাঁকে।

পাঁচ লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে! খয়ের এই টাকার লোভ সামলাতে পারবে না। এই সময় দরজা খোলার শব্দ হলো।

মুখ থেকে হাত সরালেন তিনি।

'তোমাকে খুব আতঙ্কিত দেখাচ্ছে, মা।' বেডরুমে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল নজিবুর।

ছেলেকে দেখে বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল নাফিসার। বিছানা ছেড়ে দাঁড়ালেন তিনি, তারপর আবার ধপ করে বসে পড়লেন। মায়ের মুখোমুখি একটা আরামকেদারায় গা ছেড়ে দিল নজিবুর, গলায় আটকানো পেনডান্টটা আঙুল দিয়ে নাড়াচাড়া করছে। 'তুমি যে সমস্যা নিয়ে চিন্তিত, আমিও ওই একই সমস্যা নিয়ে ভাবছি। তোমার কাছে কোন সমাধান নেই, আমার কাছে আছে। খয়েরউদ্দিনকে ছাড়াই চলতে হবে তোমাকে। তার ওপর তুমি নির্ভর করো, আমি জানি–সেজন্যে দুঃখিত। আসলে, তাকে এখন আর আমরা বিশ্বাস করতে পারি না। পাঁচ লাখ টাকার লোভ তার পক্ষে সামলানো সম্ভব নয়।'

কিছু বলার জন্যে মুখ খুললেন নাফিসা, কিন্তু কোন আওয়াজ বেরুল না।

'এভাবে মুষড়ে পড়ো না তো!' প্রায় ধমক দিল নজিবুর। 'সব আমার ওপর ছেড়ে দাও। ব্যাপারটা দুঃখজনক, তবে আমাদের দু'জনের জন্যেই প্রয়োজন।'

হাঁপাতে হাঁপাতে নাফিসা কোন রকমে বলতে পারলেন, 'নজিবুর! কি বলছ তুমি?'

'খয়েরউদ্দিনের ব্যবস্থা করতে চাইছি। তাকে রেখে লাভটাই বা কি, বলো? এমনিতেও তো বুড়ো হয়ে গেছে, তার ওপর আফিম খেয়ে সব সময় ঢুলছে, কাজ-র্কম তেমন আর করতে পারে না। যে গরু দুধ দেয় না, তাকে কসাইয়ের হাতে তুলে দেয়াই তো নিয়ম।'

আতঙ্কে বিস্ফারিত চোখে ছেলের দিকে তাকিয়ে থাকলেন

নাফিসা। 'ব্যবস্থা করতে চাও? মানে?'

'না বোঝার ভান কোরো না তো!' বিরক্ত দেখাল নজিবুরকে। 'তুমি বোকা সাজলে আমার অসহ্য লাগে। ব্যবস্থা মানে ব্যবস্থা। আমি ওকে রাখতে চাই না।'

'নজিবুর, বাপ আমার!' সামনে ঝুঁকে মিনতি করলেন নাফিসা। 'আমি তোমার মা, আমার কথা শোনো, বাপ! ছেলেকে মা-ই সবচেয়ে বেশি ভালবাসে। তোমাকে বুঝতে হবে, এটা তোমার একটা মানসিক রোগ। ড. সাখাওয়াৎ খুব নাম করা সাইক্রিয়াট্রিস্ট, অনেক পাগলকেও সুস্থ করে তুলেছেন। তিনি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। চলো, তোমাকে আমি তাঁর কাছে নিয়ে যাই...'

শয়তানি হাসি ফুটল নজিবুরের মুখে। 'তোমার কাকার মত আমাকেও পাগলা গারদে পাঠাবার মতলব করছ, না? আমি পাগলা গারদে গেলে, তোমার কি হবে? কথাটা ভেবে দেখেছ? তোমার বন্ধু-বান্ধবরা কি বলবে?' নজিবুর দেখল নাফিসা বেগম দু'হাতে আবার মুখ ঢাকলেন। 'সব আমার ওপর ছেড়ে দাও। খয়েরের বদলে অন্য লোক এনে দেব তোমাকে। কয়েক দিন পর আবার তুমি আগের মত স্বাভাবিক জীবন ফিরে পাবে।' চোখ দুটো তার জ্বলে উঠল। 'কিছু একটা বলো!'

এই সময় টেলিফোন এল। ভুরু কুঁচকে হাত বাড়াল নজিবুর। রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল। 'হ্যালো?'

গাউস বখতের দোকানে বীভৎস ছবিটা দেখার পরদিনই তাঁর টেলিফোন লাইনে আড়িপাতা যন্ত্র ফিট করা হয়েছে, ফলে নিজের অফিসে বসে গাউস বখত আর নজিবুর রহমানের কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছে শহীদ। এক্সটেনশন লাইনে কান পেতে কামালও শুনছে।

'মি. নজিবুর?' জিজ্ঞেস করলেন গাউস বখত।

'কে আপনি?'

'অ্যান্টিকস অ্যান্ড আর্ট গ্যালারির গাউস বখত।'

'ভাল কোন খবর?' জিজ্ঞেস করল নজিবুর, গলায় চাপা উত্তেজনা। 'আমার পেইন্টিং বিক্রি হয়ে গেছে?'

'ছবিটা সম্পর্কেই আলাপ করতে চাই, মি. নজিবুর,' ফিসফিস করে কথা বলছেন গাউস বখত। 'আমার দোকানে প্রাইভেট ডিটেকটিভ শহীদ খান ও পুলিস ইন্সপেক্টর মিনহাজ হোসেন এসেছিলেন। ওরা জানতে চাইছিলেন ছবিটা কে এঁকেছে।'

দম আটকানোর আওয়াজ হলো। 'পুলিস? প্রাইভেট ডিটেকটিভ? আমার ছবি সম্পর্কে তাদের আগ্রহ হবে কেন?'

'আমারও তো সেই প্রশ্ন, মি. নজিবুর,' বললেন গাউস বখত। 'ওদের ধারণা, ছবিটার সঙ্গে খুনগুলোর সম্পর্ক আছে, মানে ছবিটা কে এঁকেছে জানতে পারলে তাঁরা নাকি সিরিয়াল কিলারকে ধরতে পারবেন। কেন তাঁরা এ-কথা ভাবছেন, আমার কোন ধারণা নেই। আমি বলেছি, আর্টিস্টের পরিচয় আমার জানা নেই। কিন্তু তারপরও আমার ওপর চাপ দিচ্ছেন। আজ বা কাল আবার তাঁরা আসবেন, মি. নজিবুর। আপনার কি আপত্তি আছে, ওঁদেরকে যদি বলি ছবিটা আপনার আঁকা?'

'পুলিস কেন, কাউকেই আপনি আমার পরিচয় জানাতে পারবেন না!' খেঁকিয়ে উঠল নজিবুর। 'ছবিটা এই শর্তেই আপনাকে দেয়া হয়েছে। আপনি কথা দিয়েছেন, কাজেই সেটা আপনাকে রক্ষা করতে হবে। পুলিসকে আপনি কিছু বললে, গাউস বখত, আপনার ব্যবসায় আমি লালবাতি জ্বালিয়ে দেব!' খটাস করে রিসিভার নামিয়ে রাখার আওয়াজ হলো।

'আর কোন সন্দেহ আছে?' রিসিভার নামিয়ে রেখে জিজ্ঞেস

করল শহীদ।

মাথা নেড়ে কামাল বলল, 'না। নজিবুরই আমাদের সিরিয়াল কিলার।'

'তুই থানায় যা,' সহকারীকে নির্দেশ দিল শহীদ। 'ইন্সপেক্টর মিনহাজকে সব কথা খুলে বল। পুলিসকে পুলিসের কাজ করতে দেয়া উচিত।'

'আর তুই? তুই কি করবি?'

রহস্যময় হাসি হেসে শহীদ বলল, 'সেটা এমন কি তোরও এখন জানার দরকার নেই। তবে তুই যদি পুলিসী অভিযানে অংশগ্রহণ করিস, কোন এক পর্যায়ে আমাকে দেখতে পাবি।'

আট

নজিবুর চলে যাবার পর খালি দেয়ালের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন নাফিসা, তাঁর মনে বিবেকের সঙ্গে লড়াই চলছে। তিনি উপলব্ধি করছেন, এখন তাঁর পুলিসকে টেলিফোন করে জানানো উচিত যে নজিবুর সিরিয়াল খুনী, বদ্ধ একটা পাগল, সে আরও একটা খুন করার পরিকল্পনা আঁটছে। কিন্তু সেই সঙ্গে এ-ও বুঝতে পারছেন, এ কাজ তাঁর দ্বারা সম্ভব নয়।

নিজেকে তিনি যুক্তি দিলেন, এ-কথা তো মিথ্যে নয় যে আফিমের নেশা আর বয়েসের ভার অক্ষম করে তুলেছে

খয়েরউদ্দিনকে। তাকে যদি পথ থেকে সরিয়ে দিতে পারে, নজিবুর হয়তো আবার সুস্থ হয়ে উঠবে, একের পর এক খুনগুলোও আর ঘটবে না। সম্ভবত আজ রাতের মধ্যে খয়েরের একটা ব্যবস্থা করবে নজিবুর। লাশটা কিভাবে সরানো হবে, এটা নিয়ে নিজেকে তিনি মাথা ঘামাবার অনুমতি দিলেন না। গাউস বখতকে তিনি চেনেন, তাঁর স্বামী লোকটার কাছ থেকে এটা-সেটা কিনতেন। এই লোক পুলিসের কথা তুলছে কেন?

পা কাঁপছে, তবু বিছানা ছেড়ে দাঁড়ালেন নাফিসা। এই বাড়িতে তিনি আর এক মুহূর্তও থাকবেন না। একটা সুটকেস নিয়ে ভাল কোন হোটেলে উঠবেন। সমস্ত বিপদ না কাটা পর্যন্ত দূরে সরে থাকাটাই বুদ্ধিমতীর কাজ হবে।

সুটকেসে কাপড়চোপড় ভরে সেটা বন্ধ করলেন, এই সময় আবার দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল নজিবুর। 'খুব ভাল সিদ্ধান্ত নিয়েছ,' বলল সে। 'দিন কয়েক বাইরে থাকাই উচিত তোমার। কোথায় উঠবে?'

একটা হোটেলের নাম বললেন নাফিসা।

মাথা ঝাঁকাল নজিবুর। 'হোটেল ছেড়ে বেরিয়ো না। বিপদ কেটে যাবার পর আমি তোমাকে টেলিফোন করব। চিন্তা কোরো না, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'গাউস বখত। সে তোমাকে পুলিসের কথা বলল কেন?'

'বললাম তো, চিন্তা কোরো না। সব আমার ওপর ছেড়ে দাও। চলো, সুটকেসটা গাড়িতে তুলে দিই। তুমি টয়োটাটা নিয়ে যাও, মার্সিডিজটা আমার লাগতে পারে। ড্রাইভ করতে সমস্যা হবে না তো?'

'নজিবুর!' শেষ একবার দুর্বল চেষ্টা করে দেখতে চাইছেন

নাফিসা। 'বাপ আমার...'

'এসো বলছি!' কড়া ধমক দিল নজিবুর। 'আমি চাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়ি থেকে বিদায় হও তুমি। আর মনে রেখো, কাউকে কিছু বলবে না!'

পরাজিত ও আতঙ্কিত নাফিসা কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেছেন, ছেলের পিছু নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন। ছেলে তাকে গাড়িতে তুলে দিল। কাঁপা হাতে স্টার্ট দিলেন নাফিসা।

'উদ্ধার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি'-র পাইকপাড়া শাখা অফিসে পৌঁছে হায়দার দেখল, তসলিমার জায়গায় হেড অফিস থেকে মীনা চৌধুরীকে পাঠানো হয়েছে। মনে মনে স্বস্তিবোধ করল হায়দার। মীনার সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে তার, নিজের কাজে অত্যন্ত দক্ষ সে, আচার-ব্যবহারও সংযত। হায়দারকে দেখেই প্রথমে সে জানতে চাইল, 'আপনার শ্বশুর কেমন আছেন, হায়দার ভাই?'

'ব্যাপারটা মির‍্যাকিউলাসই বলতে হবে,' জবাব দিল হায়দার। 'সবাই যখন ধরে নিয়েছি আর কোন আশা নেই, এমন কি ডাক্তাররাও হাল ছেড়ে দিয়েছেন, দেখা গেল তাঁর হার্ট আবার স্বাভাবিকভাবে কাজ শুরু করেছে। ডাক্তাররা নতুন করে পরীক্ষা করে বললেন, এ-যাত্রা আর ভয়ের কোন কারণ নেই, যদিও কারণটা তাঁরা ব্যাখ্যা করতে পারেননি।'

'রাখে আল্লাহ মারে কে, তাই না?' মীনা চৌধুরীর মুখে আনন্দের হাসি। 'আপনার বউ কেমন আছেন?'

'কাল রাতে সে-ও আমার সঙ্গে ঢাকায় ফিরেছে,' বলল হায়দার। 'শ্বশুরের দেখাশোনা করছে আমার ছোট শ্যালিকা।'

'বেশ, ভাল। নেসার সাহেব এখন খানিকটা সুস্থবোধ করছেন। তিনিই আমাকে এখানে পাঠালেন। বললেন, আপনি একা সব দিক্ সামলাতে পারবেন না। আহা, বেচারি! মেয়েকে নিয়ে কি গর্বই না করতেন! বলতেন, ও আমার ছেলের অভাব পূরণ করছে–দেখছেন না, একাই কেমন একটা এনজিও চালাচ্ছে!'

কথা না বলে নিজের টেবিলের সামনে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকল হায়দার।

'আমাদের পুলিস বিভাগ কোন কম্মেরই নয়,' বলল মীনা। 'একজন ম্যানিয়াক একের পর এক খুন করে যাচ্ছে, অথচ তাকে ধরতেই পারছে না! শুনেছেন তো, আমাদের সাহেব পাঁচ লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন? কই, তাতেও তো কোন লাভ হচ্ছে না!'

তসলিমার কথা শুনতে বা ভাবতে খারাপ লাগছে হায়দারের। মেয়েটার প্রতি তার কোন দুর্বলতা ছিল না, পরস্পরকে তারা ভালও বাসেনি, কিন্তু তবু তসলিমার এই মর্মান্তিক পরিণতি মেনে নিতে তার খুব কষ্ট হচ্ছে। 'খুনী অবশ্যই ধরা পড়বে,' বিড়বিড় করে বলল সে। চেয়ারে বসে কয়েকটা ফাইল টেনে নিয়ে পরীক্ষা করল, তারপর সেগুলো বাড়িয়ে ধরল মীনার দিকে। 'এগুলো চেক করতে হবে, মীনা। আমি রেকর্ড রুমে যাচ্ছি, পেন্ডিং কাজগুলো সেরে রাখি।'

ভেতরের কামরায় ঢুকে একটা চেয়ারে বসে থাকল হায়দার। কাজের কথা বলে আসলে পালিয়ে এসেছে সে। খবরের কাগজে তসলিমা খুন হবার খবরটা পড়ে তার ভায়রা মন্তব্য করেছে, 'আমাদের এটা রক্ষণশীল সমাজ। কোন মেয়ে যদি স্বেচ্ছাচারী

হয়ে ওঠে, তার পরিণতি এরকম না হওয়াটাই আশ্চর্যজনক!' খবরটা পড়ে নেসার আহমেদের বাড়িতে টেলিফোন করেছিল হায়দার। নেসার আহমেদ কোন কলই রিসিভ করছিলেন না। তসলিমার সৎ মায়ের সঙ্গে কথা হয় তার। হায়দার ফোন করায় ভদ্রমহিলা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

বাসে চড়ে ঢাকায় আসার পথে শাহানাও তাকে সান্ত্বনা দিয়েছে। কথায় কথায় হারানো বোতামটার রহস্যও জানতে পারে হায়দার। 'বোতামগুলো দেখতে ভারি সুন্দর, তাই গলায় একটা ঝুলিয়েছি আমি!' চেইনের সঙ্গে লকেটের মত ঝুলছিল ওটা শাহানার বুকে, দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে হায়দার।

তসলিমার মুখটা বারবার ভেসে উঠছে চোখের সামনে। খুনীর প্রতি প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে তার। রাগ হচ্ছে পুলিসের ওপরও। এতগুলো খুন হয়ে গেল, অথচ এখনও তারা ধরতে পারছে না কে দায়ী? হায়দারের ইচ্ছে হলো সে নিজেই বেরিয়ে পড়ে, খুঁজে দেখে কে সেই পাষণ্ড!

থানায় পৌঁছে ইন্সপেক্টর মিনহাজকে সব কথা খুলে বলল কামাল। উত্তেজনায় শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল ইন্সপেক্টরের। 'আচ্ছা, গাউস বখত তাহলে আর্টিস্টের পরিচয় জানেন! লোকটা তাহলে মিথ্যে কথা বলেছেন। চলুন, প্রথমে আমরা তাঁকেই গ্রেফতার করি!'

কামাল মাথা নেড়ে বলল, 'তাকে পরে গ্রেফতার করলেও চলবে। তাছাড়া, তাকে গ্রেফতার করে লাভই বা কি? সময় নষ্ট করা হলে খুনী পালাতে পারে, এই কথাটা আপনি ভাববেন না?'

'অন্য এক উৎস থেকে কিছু সূত্র পেয়েছি আমি,' বললেন

ইন্সপেক্টর। 'শ্যামলি যে দিন খুন হয় সেদিন সন্ধের দিকে নীল জ্যাকেট পরা এক তরুণকে দেখা গেছে লালমাটিয়ার কাছাকাছি। তরুণের ডান কানে সোনার রিঙ ছিল। নজিবুরের ডান কানে কি সোনার রিং আছে?'

কামাল বলল, 'তা তো জানি না।'

'নজিবুরের নাকের পাশে কি বড় একটা তিল আছে?'

'তা-ও আমি জানি না,' বলল কামাল।

'নজিবুরের হাতের আঙুল কি অস্বাভাবিক লম্বা?'

কথা না বলে অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল কামাল।

'হেডকোয়ার্টারে আমার যারা বড়কর্তা, তাঁদের সঙ্গে নাফিসা বেগমের খাতির আছে। মন্ত্রী-মিনিস্টাররাও ভদ্রমহিলার বন্ধু। কাজেই আমার ওপর নির্দেশ আছে, নিরেট প্রমাণ ছাড়া নাফিসা বেগম বা তাঁর ছেলেকে হ্যারাস করা যাবে না।'

'নিরেট প্রমাণ বলতে কি বোঝাতে চান আপনি?' জিজ্ঞেস করল কামাল।

ইন্সপেক্টর জবাব দিলেন, 'প্রথমে জানতে হবে নজিবুরের ডান কানে সোনার রিঙ আছে কিনা। আমি যে সূত্র থেকে বর্ণনা পেয়েছি, সেই বর্ণনার সঙ্গে তার চেহারা মেলে কিনা দেখতে হবে। নাকের পাশে তিল। আঙুলগুলো সত্যি কি লম্বা তার? তারপর প্রমাণ সংগ্রহ করতে হবে। শফিকুর রহমানের জ্যাকেট এতিমখানায় দান করা হয়েছে, নাকি রেখে দিয়েছে সে? সে যদি খুনী হয়, জ্যাকেটটা ওই বাড়িতে পাওয়া যাবে, ইতিমধ্যে সেটা পুড়িয়ে ফেলা না হলে। পুড়িয়ে ফেললেও, বোতামগুলো হয়তো পাওয়া যাবে।'

'এখন তাহলে আপনি কি করতে চান?' বিরক্ত হয়ে জানতে

চাইল কামাল।

'ইচ্ছে হলে আপনি আমার সঙ্গে আসতে পারেন, তাহলেই দেখতে পাবেন কি করতে চাই,' বলে দলবল নিয়ে বাইরে বেরুবার প্রস্তুতি নিলেন ইন্সপেক্টর।

ভেতরের ঘরে এখনও গালে হাত দিয়ে বসে আছে হায়দার, মীনা এসে খবর দিল, 'হায়দার ভাই, পুলিস ইন্সপেক্টর মিনহাজ হোসেন এসেছেন, আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।'

'আবার কি চায়?' রেগে গেল হায়দার। তারপর কি ভেবে বলল, 'ঠিক আছে, পাঠিয়ে দাও এখানে।'

ইন্সপেক্টর একা নয়, সঙ্গে কামালও ঢুকল ভেতরের কামরায়। 'এই যে, হায়দার সাহেব, আপনার জ্যাকেটটা ফেরত দিতে এলাম।'

জোর করে একটু হাসল হায়দার। 'ধন্যবাদ। আশা করি আমাকে আর কোন ঝামেলায় পড়তে হবে না।'

জ্যাকেটটা হায়দারের হাতে ধরিয়ে দিলেন ইন্সপেক্টর। 'আরে না, আপনাকে কেন ঝামেলায় ফেলতে যাব। তবে আপনার সাহায্য পেলে খুশি হই।'

'কি সাহায্য?'

'তসলিমা আপনার সহকারিণী ছিলেন। তাছাড়া, কোম্পানি মালিকের মেয়ে ছিলেন তিনি। আপনি নিশ্চয়ই চান তাঁর খুনী ধরা পড়ুক?'

'একশো বার চাই,' কঠিন সুরে বলল হায়দার।

'তাহলে গোটা ব্যাপারটা আপনাকে ব্যাখ্যা করে শোনাতে হয়,' বললেন ইন্সপেক্টর। 'শ্যামলি যেখানে খুন হয় সেই জায়গার

কাছাকাছি একটা তামার বোতাম পাই আমরা। বোতামটা শুধু শাকুর অ্যান্ড সন্সের তৈরি জ্যাকেটে ব্যবহার করা হয়। ওই জ্যাকেট আপনিও একটা কিনেছিলেন। আর কিনেছিলেন নামকরা ব্যবসায়ী শফিকুর রহমান। শফিকুর রহমান ছ'মাস আগে মারা গেছেন। তাঁর বাড়ি থেকে বলা হয়েছে, তিনি মারা যাবার পর অন্যান্য কাপড়চোপড়ের সঙ্গে জ্যাকেটটা এতিমখানায় দান করা হয়েছে। কিন্তু এতিমখানা থেকে বলা হচ্ছে, তারা কোন জ্যাকেট পায়নি।

তারপর অন্য এক সূত্র থেকে আমি জানতে পারি, শ্যামলি যেদিন খুন হয় সেদিন সন্ধের দিকে লালমাটিয়ার কাছে এক ভদ্রমহিলা নীল জ্যাকেট পরা এক তরুণকে দেখেছে। তরুণের হাতের আঙুল ছিল অস্বাভাবিক লম্বা, ডান কানে ছিল সোনার ছোট্ট রিঙ, নাকের পাশে আছে বড় একটা তিল। এই বর্ণনার সঙ্গে আপনার চেহারা মেলে না, কাজেই সম্ভাব্য হত্যাকারীর তালিকা থেকে আপনাকে বাদ দেয়া হয়েছে। শফিকুর রহমানের এক ছেলে আছে, নাম নজিবুর রহমান। কিন্তু তাকে আমরা কেউ দেখিনি। যারা দেখেছে তারাও তার চেহারা মনে করতে পারছে না, কিংবা প্রকাশ করতে চাইছে না। এখন আমাদের উচিত শফিকুর রহমানের বাড়িতে যাওয়া, নজিবুরকে ডেকে তার সঙ্গে কথা বলা। সেই সুযোগে তার চেহারাটাও দেখে নিতে পারব। কিন্তু সমস্যা সৃষ্টি করছে শফিকুর রহমানের স্ত্রী মিসেস নাফিসার সামাজিক মর্যাদা। মন্ত্রী-মিনিস্টার থেকে শুরু করে পুলিসের বড় কর্তারা তাঁর বন্ধু-বান্ধব। আমি সামান্য একজন ইন্সপেক্টর হয়ে তাঁকে বা তাঁর ছেলেকে বিরক্ত করলে, তাঁরা যদি অভিযোগ করেন, আমার ক্যারিয়ারের ক্ষতি হবে। বিশেষ করে যদি দেখা যায় নজিবুরের

সঙ্গে আমার সূত্র থেকে পাওয়া চেহারার বর্ণনা মিলছে না। তাই একটা বুদ্ধি করেছি।'

'কি বুদ্ধি?'

'আপনি রাজি হলে ওদের বাড়িতে আপনাকে পাঠাব,' বললেন ইন্সপেক্টর। 'যে-ই দরজা খুলুক, আপনি নজিবুরের সঙ্গে দেখা করতে চাইবেন। বীমা কোম্পানিতে চাকরি করেন, কাজেই এটাকেই অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন। বলবেন, বীমা করবেন কিনা জানতে এসেছেন।'

মাথা নাড়ল হায়দার। 'এ-সবের মধ্যে আমি জড়াতে চাই না, দুঃখিত।'

তুরুপের তাসটা এবার ছাড়লেন ইন্সপেক্টর। 'ভেবে দেখুন, হায়দার সাহেব! নজিবুরই যদি খুনী হয়, আর আপনি যদি তাকে সনাক্ত করতে পারেন, নেসার আহমেদের পুরস্কারের টাকাটা আপনিই পাবেন। পাঁচ লাখ টাকা!'

হাঁ হয়ে গেল হায়দার। 'পাঁচ লাখ টাকা? আমি পাব?'

'হ্যাঁ, আপনিই পাবেন, নজিবুরই যদি সিরিয়াল কিলার হয়।'

পাঁচ লাখ টাকা পেলে কি করবে ভাবছে হায়দার। তার দিকে তাকিয়ে ইন্সপেক্টর বুঝতে পারলেন, টোপ গিলেছে।

'সত্যি যদি পুরস্কারের টাকাটা পাই, সাহায্য করতে আমার আপত্তি নেই,' বলল হায়দার।

ইন্সপেক্টরের চেহারা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। 'ভেরি গুড।'

'আমাকে কি করতে হবে আরেকবার বলুন।'

'চলুন গাড়ি নিয়ে রওনা হয়ে যাই, পথে সব ব্যাখ্যা করব,' বললেন ইন্সপেক্টর। 'জ্যাকেটটা পরে নিন। এটা দেখলে নজিবুরের কি প্রতিক্রিয়া সেটাও আমাদের জানা দরকার।'

*

বনানীর এই রোডে আরও অনেক গাড়ি পার্ক করা রয়েছে। পুলিস জীপ নিয়ে আসেনি, এসেছে প্রাইভেট কয়েকটা কার নিয়ে। রাস্তার উল্টোদিকে সাদা পোশাক পরা পুলিসের লোকজন বসে আছে কারগুলোয়। হায়দারকে বারবার সাবধান করে দেয়া হয়েছে, কোন অবস্থাতেই নজিবুরদের বাড়ির ভেতর ঢুকবে না সে। দরজায় নক করবে, নজিবুরকে ডাকবে। সে এলে ভাল, না এলে ফিরে আসবে। পুলিস তার ওপর সারাক্ষণ নজর রাখবে। নজিবুর যদি কোন বিপদ হয়ে দেখা দেয়, সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশনে যাবে তারা।

হায়দার জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু নজিবুর যদি আমাকে ভেতরে ডাকে?'

'ডাকলেও আপনি ঢুকবেন না।'

পুলিস পজিশন নেয়ার খানিক পর নিজের গাড়ি নিয়ে নজিবুরদের বাড়িতে ঢুকল হায়দার। গাড়ি থেকে নেমে রুমাল দিয়ে মুখের ঘাম মুছল সে। ভয় লাগাটা স্বাভাবিক। নজিবুর যদি খুনী হয়, আর তার যদি সন্দেহ হয় ফাঁদ পাতা হয়েছে, হায়দারকে সে ছাড়বে বলে মনে হয় না।

কলিংবেল বাজিয়ে অপেক্ষা করছে হায়দার। ভাবছে, পাঁচ লাখের লোভে প্রাণটা না হারাতে হয়।

হঠাৎ দরজা খুলে গেল। দরজার ভেতর দাঁড়িয়ে রয়েছে নজিবুর। প্রথমেই তার ডান কানে সোনার ছোট্ট রিঙটা দেখতে পেল হায়দার। তারপর দেখল নাকের পাশে তিলটা। গলা শুকিয়ে গেল তার। শ্যামলি, শওকত আর তসলিমার খুনীর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে! কথাটা ভাবতেই হাঁটু জোড়া কাঁপতে শুরু

করল।

'হ্যাঁ, বলুন–কাকে চাই?' জিজ্ঞেস করল নজিবুর।

নিজেকে কোন রকমে সামলে নিল হায়দার। 'আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত,' বলল সে। 'আপনিই কি মি. নজিবুর রহমান?'

'আপনার জ্যাকেটটা তো ভারি সুন্দর,' বলল নজিবুর। 'এরকম একটা জ্যাকেট আমার আব্বুরও ছিল। কি চান আপনি?'

জিভের ডগা দিয়ে ঠোঁট ভেজাল হায়দার। 'এসেছিলাম বীমার একটা পলিসি নেবেন কিনা জানতে। তবে বুঝতে পারছি, আপনাকে অসময়ে বিরক্ত করা হচ্ছে। ঠিক আছে, পরে এক সময় আসব আবার।' এক পা পিছাল সে, কিন্তু তারপরই পাথর হয়ে গেল নজিবুরের হাতে একটা পিস্তল বেরিয়ে আসতে দেখে।

'সোজা ভেতরে ঢুকুন, তা না হলে গুলি করতে বাধ্য হব আমি,' হিসহিস করে বলল নজিবুর।

পিস্তল দেখে কুঁকড়ে গেল হায়দার। গুলি খাবার ভয়ে নড়তে পারছে না।

ড্রইংরুমে এক পা পিছাল নজিবুর। 'ঢুকুন!' হুমকি দিল সে।

ইন্সপেক্টর আর কামালের কথা ভাবল হায়দার, ওঁরা তাকে রাস্তার ওপার থেকে লক্ষ করছে। ভেতরে ঢুকতে নিষেধ করলেও, পিস্তলের মুখে তার কিছু করার নেই। চৌকাঠ টপকে ভেতরে পা রাখল সে।

'আপনি বুদ্ধিমান,' বলল নজিবুর। 'এবার দরজাটা বন্ধ করুন।'

দরজা বন্ধ করল হায়দার।

'বোল্টের ভেতর হুড়কো ঢোকান।'

নির্দেশ পালন করল হায়দার, হাত দুটো কাঁপছে।

'ওই দরজা দিয়ে করিডরে বেরোন, তারপর সিঁড়ির দিকে হাঁটবেন,' নির্দেশ দিল নজিবুর।

নজিবুর পিস্তল হাতে পিছনে থাকল, সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে এল হায়দার। লিভিং রুমে ঢুকে থামল সে। নজিবুরের নির্দেশে একটা চেয়ারে বসল। হাঁটুর ওপর ঘসে তালুর ঘাম মুছল।

বড় একটা ডেস্কের কিনারায় বসে পা দোলাতে শুরু করল নজিবুর। 'পিস্তলটা হাতে রেখেছি বাধ্য হয়ে, কিছু মনে করবেন না,' বলল সে। 'আমাকে কিডন্যাপ করা হতে পারে, এই ভয়টা থেকে মুক্ত হতে পারছি না। এবার বলুন, কে আপনি?'

হায়দার খানিকটা শক্তি পেল মনে। নজিবুরের মত ধনী ব্যক্তির কিডন্যাপ হবার ভয় থাকাটা স্বাভাবিক। এতটা হয়তো ভয় না পেলেও চলে তার। 'আমি হায়দার আলি,' বলল সে। 'উদ্ধার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির পাইকপাড়া শাখার ম্যানেজার। এসেছিলাম আপনি কোন বীমা পলিসি নেবেন কিনা জানতে। আপনি ছবি আঁকেন, বড় শিল্পীরা তাঁদের ছবিও বীমা করে রাখেন, তাই ভাবলাম...'

'আমি ছবি আঁকি, তা আপনি জানলেন কিভাবে?'

নজিবুর ছবি আঁকে, এ-কথা গাড়িতে আসার পথে ইন্সপেক্টর তাকে জানিয়েছেন। প্রসঙ্গটা তোলা বোকামি হয়ে গেছে, বুঝতে পারল সে। নজিবুরের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছে না।

'কথাটা কি আপনি গাউস বখতের মুখে শুনেছেন?' জানতে চাইল নজিবুর।

'হ্যাঁ, তবে গোপনে–আমাকে বিশ্বাস করে বলেছেন। আমি

কাউকে বলব না, এই প্রতিশ্রুতি আদায় করার পর। উনি বললেন, আপনার ছবিগুলো খুবই উঁচুদরের, অত্যন্ত দামী।'

'হ্যাঁ, দামী তো বটেই,' পিস্তলটা পকেটে ভরে রাখল নজিবুর। 'সত্যি আমি দুঃখিত। পিস্তল বের করে আপনাকে হয়তো ভয় পাইয়ে দিয়েছি। কি জানেন, আজকাল কাউকে বিশ্বাস করা যায় না। চোর-ডাকাতে দেশটা একেবারে ভরে গেছে।'

'জ্বী, ঠিকই বলেছেন। তা আপনার ছবি কি বীমা করার কথা ভাবছেন?'

'আগে কখনও ভাবিনি, এখন ভাবছি,' বলল নজিবুর। 'তবে তার আগে আমার ছবিগুলো আপনার দেখা উচিত।'

'ছবির আমি কি বুঝি, বলুন!' বলে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল হায়দার। 'আপনার অনেক সময় নষ্ট করলাম।' এই বাড়ি ছেড়ে কিভাবে পালানো যায়, এটাই তার একমাত্র চিন্তা। 'আপনার ছবির একটা তালিকা, আনুমানিক মূল্যসহ, আমাদের অফিসে পাঠিয়ে দিলেই হবে, বাকি যা করার আমরা করব...'

'আরে থামুন, এখুনি আপনাকে আমি ছাড়ছি না,' বলল নজিবুর। ডেস্ক থেকে নামল সে। 'এত কষ্ট করে যখন এসেছেন, আমার ছবি না দেখে চলে যাবেন, তাই কি হয়। আসুন আমার সঙ্গে।' হায়দারের দিকে তাকিয়ে আছে সে, এক হাতে পেনডান্টটা নাড়াচাড়া করছে। মুখে ঠোঁট টেপা হাসি।

হায়দার মরিয়া হয়ে বলল, 'কিন্তু আমার যে আরেকটা জরুরী অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে! আজ নয়, প্লীজ, আরেক দিন এসে আপনার ছবি দেখে যাব...'

কথা বলছে না নজিবুর, নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে হায়দারের দিকে। হায়দার লক্ষ করল, নজিবুরের চোখ দুটো হঠাৎ যেন

জ্বলতে শুরু করেছে।

গাড়ির ভেতর থেকে ইন্সপেক্টর ও কামাল দেখল, বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ল হায়দার। 'লোকটা স্টুপিড!' বিস্ফোরিত হলেন ইন্সপেক্টর। 'এত করে নিষেধ করলাম, কিন্তু শুনল না!'

'ইচ্ছে করে ঢোকেননি, আমার ধারণা ঢুকতে তাঁকে বাধ্য করা হয়েছে,' বলল কামাল। 'কি করবেন তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নিন!'

'কি সিদ্ধান্ত নেব আপনিই বলুন! লোকটা এতই বোকা যে দরজার সামনে এমনভাবে দাঁড়িয়ে ছিল, ভেতরে কে আছে দেখাই গেল না! হয়তো মিসেস নাফিসা দরজা খুলে ড্রইংরুমে বসতে বলেছেন।'

'মিনহাজ সাহেব, মারাত্মক ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাচ্ছে,' সাবধান করে দিল কামাল। 'মিসেস নাফিসা বা চাকরবাকররা যদি দরজা খুলে না থাকে? যদি নজিবুরই খুলে থাকে? আমার কিন্তু ভাল ঠেকছে না।'

সাব-ইন্সপেক্টর নিয়াজ বলল, 'ব্যাপারটা কেঁচে গেছে, স্যার। কামাল সাহেব ঠিকই বলছেন, এখুনি কিছু একটা করা দরকার আমাদের।'

ইন্সপেক্টর মিনহাজ এখনও ইতস্তত করছেন। 'কিন্তু নজিবুর যদি খুনী না হয়? সে হয়তো হায়দার সাহেবকে খাতির করে বসিয়ে চা-নাস্তা খাওয়াচ্ছে। এই সময় আমরা যদি হাজির হই, কেমন হবে সেটা?'

'আর সে-ই যদি খুনী হয়?' কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করল কামাল। 'মিনহাজ সাহেব, হায়দার খুন হয়ে যেতে

পারেন!'

হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করলেন ইন্সপেক্টর, বলতে গেলে কামালের দেখাদেখিই। 'চলুন তাহলে। নিয়াজ, গুলির শব্দ হলে বাকি সবাইকে নিয়ে ছুটে আসবে তুমি, ঠিক আছে?'

গাড়ি থেকে নেমে রাস্তা পেরুল ইন্সপেক্টর, কামাল তার পাশেই রয়েছে। 'এই সময় মি. শহীদ এখানে থাকলে মনে খানিকটা ভরসা পেতাম,' বললেন তিনি।

'ও আশপাশেই কোথাও আছে,' চাপা গলায় বলল কামাল। 'বাড়ির ভেতর থাকলেও আমি আশ্চর্য হব না।'

'তাই!' বিস্মিত দেখাল ইন্সপেক্টরকে।

লোহার গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকল ওরা। সদর দরজায় পৌঁছে কলিংবেলের বোতামে চাপ দিলেন ইন্সপেক্টর। দু'জনে দরজার দু'পাশে দাঁড়িয়েছে। ওরা দেখতে পেল না, দোতলার ছাদ থেকে নীল শার্ট পরা এক লোক ঝুঁকে ওদেরকে মুহূর্তের জন্যে দেখে নিল, তারপর পিছিয়ে গেল আবার।

শিকারী বিড়ালের মত চোখ দুটো জ্বলছে, ধীর পায়ে হায়দারের দিকে এগিয়ে আসছে নজিবুর। এই সময় তার পিছনে ডেস্কে রাখা টেলিফোনটা বেজে উঠল। টেলিফোনের আওয়াজ থমকে দাঁড় করিয়ে দিল তাকে। হাত তুলে হায়দারকে একটা চেয়ার দেখাল সে, বলল, 'ওখানে বসুন। এক চুল নড়বেন না।'

হায়দারের দিকে পিছন ফিরে ডেস্কের কাছে ফিরে এল সে। রিসিভার তুলল। 'ইয়েস? কে বলছেন?'

'সাব-ইন্সপেক্টর কাইয়ুম চৌধুরী, রমনা থানা থেকে। আপনি কি মি. নজিবুর রহমান?'

হায়দার লক্ষ করল, নজিবুরের চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে।

'হ্যাঁ,' ফোনে বলল নজিবুর। 'কি ব্যাপার?'

'মি. নজিবুর, আপনাকে এখুনি একবার হলি ক্রিসেন্ট হসপিটালে আসতে হবে। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, মারাত্মক একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটেছে।'

'অ্যাক্সিডেন্ট...আমার মা?'

'জ্বী, স্যার। যতটুকু জানা আছে, উনি গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। একটা ট্রাকের সঙ্গে সরাসরি ধাক্কা লাগে...'

'উনি কি মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন?'

'সত্যি দুঃখিত, স্যার–হসপিটালে নিয়ে আসার পরপরই মারা গেছেন তিনি।'

নজিবুরের ঠোঁটে হাসি ফুটল, দেখে শিউরে উঠল হায়দার।

'ধন্যবাদ, সাব-ইন্সপেক্টর,' ফোনে বলল নজিবুর। 'আমার অ্যাটর্নি মি. মোশাররফ সিদ্দিকীকে খবরটা জানান, প্লীজ। যা কিছু করার উনি করবেন।' রিসিভার নামিয়ে রাখল সে। তারপর হায়দারের দিকে ফিরে বলল, 'দারুণ একটা সুখবর পেলাম, হায়দার সাহেব। রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছেন আমার মা। অবশেষে তার হাত থেকে মুক্তি পেলাম আমি!'

আতঙ্কে চোখ দুটো বড় বড়, চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল হায়দার। 'আমাকে এবার যেতে হয়, মি. নজিবুর।'

'কি আশ্চর্য! এরইমধ্যে ভুলে গেছেন! আপনার না আমার ছবি দেখার কথা?' একটু থেমে আচমকা অন্য প্রসঙ্গে প্রশ্ন করল সে, 'আপনি তো তসলিমাকে চিনতেন, তাই না?'

ডাঙায় তোলা মাছের মত খাবি খেলো হায়দার, তারপর মাথা

ঝাঁকাল।

'আমি তসলিমার পোর্ট্রেইট নিয়ে কাজ করছি। স্রেফ রাফ একটা স্কেচ, তবু আপনার মতামত জানতে চাই আমি।'

হায়দারের শুধু একটাই চিন্তা, কিভাবে এই উন্মাদের হাত থেকে পালানো যায়। 'প্লীজ, আমাকে মাফ করতে হবে, মি. নজিবুর,' নিজের কানেই আওয়াজটা বেসুরো শোনাল। 'এখানে আমার আর দেরি করা চলে না।'

নজিবুরের হাসিটা নিষ্ঠুর হয়ে উঠল। 'আমি চাই না আপনি আমার কথার অবাধ্য হন, হায়দার সাহেব,' বলল সে, পেনডান্টটা আঙুল দিয়ে নাড়াচাড়া করছে। 'কেউ আমার অবাধ্য হলে আমি তাকে সহ্য করতে পারি না, তখন তার কপালে কি ঘটবে আমি নিজেও বলতে পারব না।' ইঙ্গিতে উল্টোদিকের একটা দরজা দেখাল হায়দারকে। 'ওদিকে এগোন, যদি ভাল চান।'

বাধ্য হয়ে সেদিকে পা বাড়াল হায়দার। শুনতে পেল কলিংবেল বাজছে। থামল সে, ঘাড় ফিরিয়ে নজিবুরের দিকে তাকাল। ভাবছে, পুলিস? ইন্সপেক্টর মিনহাজ?

'আবার কে এল?' হায়দারকে ইতস্তত করতে দেখে প্রশ্নটা তাকেই যেন করল নজিবুর। 'যাকগে, কিছু আসে যায় না। বোল্টে লোহার হুড়কোটা ঠিক মত লাগিয়েছেন তো?' হায়দার মাথা ঝাঁকাল। 'তাহলে কোন চিন্তা নেই, ভেতরে কেউ ঢুকতে পারবে না। এগোন; হায়দার। চলুন, বেশ্যা মেয়েটার স্কেচ কেমন এঁকেছি আপনাকে দেখাই। বেশ্যাই তো ছিল, কি বলেন? তা না হলে বস্তির কাছে একা একটা বাড়িতে কোন মেয়ে থাকে?'

কলিংবেলটা আবার বাজল।

আবার দাঁড়িয়ে পড়ল হায়দার।

এবার খেঁকিয়ে উঠল নজিবুর। 'যা বলছি শুনুন! দরজা খুলে ভেতরে ঢুকুন।'

তাই করল হায়দার, দরজা খুলে ঢুকে পড়ল নজিবুরের স্টুডিওতে।

স্টুডিওর প্রতিটি জানালায় গরাদ আছে, পর্দা দিয়ে ঢাকা। আলো আসছে মাথার ওপর থেকে। ছাদের একটা অংশ কাঁচ দিয়ে ঢাকা। ভেতরে অবশ্য দু'জোড়া টিউবও জ্বলছে।

ভেতরে কলিংবেল বাজছে, অথচ কেউ সাড়া দিচ্ছে না। ইন্সপেক্টর মিনহাজ সাংঘাতিক ভয় পেয়ে গেলেন। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পেরে দলবল নিয়ে সাব-ইন্সপেক্টর নিয়াজও পৌঁছে গেল সদর দরজায়। কামাল বলল, 'আর কোন উপায় নেই, হায়দার সাহেবকে বাঁচাতে হলে দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকতে হবে।'

ইন্সপেক্টর ইতস্তত করছেন। 'কিন্তু ওয়ারেন্ট ছাড়া কাজটা করা কি উচিত হবে?' কলিংবেলের বোতামে আবার তিনি চাপ দিলেন।

তারপর অকস্মাৎ দড়াম করে খুলে গেল দরজা। সামনে দাঁড়িয়ে আছে মধ্যবয়স্কা এক মেয়েলোক। তাকে পাগলিনী বললেই হয়–চোখ দুটো আতঙ্কে বিস্ফারিত, কাঁচা-পাকা চুল এলোমেলো হয়ে আছে, কোটরের ভেতর চক্কর খাচ্ছে চোখের মণি। মুখে হাত রেখে ওদেরকে চুপ থাকার সঙ্কেত দিল সে, তারপর ঘন ঘন হাতছানি দিয়ে ইশারায় ভেতরে ঢুকতে বলল। সে পিছু হটছে, হাতে পিস্তল নিয়ে সামনে বাড়ল ইন্সপেক্টর ও

কামাল। হাত তুলে একটা দরজা দেখিয়ে দিল সামিনা। তার পিছু নিয়ে করিডরে বেরিয়ে এল ওরা। একটা ঘরের খোলা দরজার সামনে দাঁড়াল সামিনা।

এগিয়ে এসে ঘরের ভেতর উঁকি দিল ওরা।

নিজের বিছানায় পড়ে রয়েছে খয়েরউদ্দিন, শরীরটা ক্ষতবিক্ষত, মারা গেছে অনেক আগেই। হায়দারের কথা ভেবে অস্থির হয়ে পড়ল কামাল, সামিনাকে সে জিজ্ঞেস করল, 'খানিক আগে এক ভদ্রলোক বাড়িতে ঢুকেছেন, তিনি কোথায়?'

ইঙ্গিতে সামিনা বোঝাবার চেষ্টা করল, সে বোবা ও কালা। তারপর ইঙ্গিতে সিঁড়িটা দেখিয়ে দিল। ওরা সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছে, এই সময় তীক্ষ্ণ একটা আর্তচিৎকার ছেড়ে সাব-ইন্সপেক্টর নিয়াজকে ধাক্কা দিয়ে পথ থেকে সরাল সামিনা, ছুটল করিডর ধরে, ড্রইংরুম হয়ে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে।

সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে ওপরে উঠছে কামাল, পিছনে ইন্সপেক্টর মিনহাজ। কনস্টেবলদের নিয়ে একতলায় ছড়িয়ে পড়ল সাব-ইন্সপেক্টর।

সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে পড়ল কামাল। শুনতে পেল নজিবুর বলছে, 'ছবিটা দেখে কি মনে হচ্ছে আপনার, হায়দার সাহেব? আমি কি তসলিমার চেহারাটা ফোটাতে পেরেছি?'

নজিবুরের হাতে ধরা ছবিটার দিকে ভাল করে তাকালই না হায়দার। চোখ ঘুরিয়ে দেয়ালে টাঙানো অন্য সব ছবি দেখছে সে। শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন শওকতের মাথা, পেট চেরা শ্যামলির লাশ, মিসেস নাফিসার কুৎসিত পোর্ট্রেইট। আরেক দেয়ালেও এরকম বীভৎস অনেক ছবি ঝুলছে।

'লক্ষ করছি, আমার ছবির তাৎপর্য বোঝার চেষ্টা করছেন আপনি,' বলল নজিবুর। 'তবে দয়া করে এদিকে একটু মনোযোগ দিন। এই বেশ্যা মেয়েটাকে আমি ঠিকমত আঁকতে পেরেছি কিনা বলুন।'

কামালের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালেন ইন্সপেক্টর, তারপর বাকি তিনটে ধাপ টপকে পৌঁছে গেলেন স্টুডিওর দরজায়, কবাট খুলে ঢুকে পড়লেন ভেতরে। কামাল তাঁকে কাভার দিচ্ছে। ইন্সপেক্টর ভেতরে ঢুকেই বজ্রকণ্ঠে হুকুম করলেন, 'নড়বেন না! পুলিস!' হাতের পিস্তলটা সরাসরি নজিবুরের দিকে তাক করলেন।

নজিবুরের শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। চোখের পলকে এক হাতে হায়দারকে জড়িয়ে ধরল সে, অপর হাতে বেরিয়ে এসেছে পিস্তলটা—এই মুহূর্তে সেটার মাজল হায়দারের পাঁজরে ডেবে আছে। 'কেউ যদি সামনে এগোন, গুলি করব আমি!' হেসে উঠে বলল নজিবুর। 'আপনারা চান, আরও একজন খুন হোক?'

স্থির হয়ে গেলেন ইন্সপেক্টর। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে কামাল, সে-ও এক চুল নড়ছে না।

হাসতে হাসতেই নজিবুর বলল, 'বুঝতে পারছি, সামিনা আপনাদেরকে ভেতরে ঢুকিয়েছে। তার কথাটা মনে না রাখা আমার বোকামি হয়ে গেছে...'

নজিবুর কথা শেষ করতে পারেনি, কাচ ভাঙার আওয়াজ হলো। ব্যাপারটা চোখের পলকে ঘটে গেল। ভাঙা কাচের সঙ্গে ছাদ থেকে নেমে এল একটা মোটা রশি, রশির সঙ্গে ঝুলছে শহীদ—নজিবুরের ঠিক পিছনের মেঝেতে নামল ও।

নজিবুরের মুখের হাসি নিভে গেল। আড়ষ্ট হয়ে গেছে সে। কার্পেটে কাচের টুকরো পড়ে থাকতে দেখল। কি ঘটেছে বুঝতে পারছে, কিন্তু পিছন ফিরে তাকাচ্ছে না।

শহীদই নিস্তব্ধতা ভাঙল। 'নজিবুর, আমরা তোমাকে দু'দিক থেকে কাভার দিচ্ছি। সিদ্ধান্তটা তোমার–এখুনি গুলি খেয়ে মরবে, নাকি জেলখানায় যাবে। বিচারে তোমার যাবজ্জীবনও হতে পারে, আবার পাগলাগারদেও পাঠানো হতে পারে। ভেবে দেখো!'

হায়দারকে ছাড়ল না নজিবুর, ধীরে ধীরে পিছন ফিরে শহীদের দিকে তাকাল। প্রসারিত হলো ঠোঁট, হাসছে সে। 'বিখ্যাত প্রাইভেট ডিটেকটিভ শহীদ খান–আপনি বলছেন, আমি পাগল?'

'আমি কিছুই বলছি না,' বলল শহীদ। 'ডাক্তাররা পরীক্ষা করে বলতে পারবেন।'

'ডাক্তাররা পরীক্ষা করে যদি বলেন আমি পাগল, তাহলে আমার ফাঁসি হবে না?' জিজ্ঞেস করল নজিবুর।

মাথা নাড়ল শহীদ। ওর হাতে একটা রিভলবার। 'না, হবে না। পাগলদের শাস্তি হয় না।'

'দেখা যাচ্ছে আপনি আমার উপকার করতে চান,' বলে আবার হাসল নজিবুর। হঠাৎ হায়দারকে ছেড়ে দিল সে। হাতের পিস্তলটাও ফেলে দিল কার্পেটে। আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে মাথার ওপর হাত তুলল সে, ধীর পায়ে শহীদের দিকে এগোচ্ছে। 'আপনি যেহেতু আমার প্রতি সদয়, আমি আপনার কাছে আত্মসমর্পণ করব। তবে, তার আগে আমার একটা কথা আছে।'

'কি কথা?'

'টাকায় কি-না হয়, বলুন?' জিজ্ঞেস করল নজিবুর। 'আমি

যদি আপনাদেরকে এক কোটি টাকা দিই, আর সেই টাকা আপনারা যদি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেন, ব্যাপারটা কেমন হয়?' কথা বলার ফাঁকে থেমে থেমে শহীদের দিকে এগোচ্ছে।

মাথা নাড়ল শহীদ। 'তোমার ধারণা ভুল, নজিবুর। টাকা দিয়ে সবাইকে কেনা যায় না।'

'দু'কোটি? তিন কোটি?' জিজ্ঞেস করল নজিবুর। 'আপনি জানেন, টাকার কোন অভাব নেই আমার। ব্যাঙ্কের টাকায় হাত না দিলেও চলবে, সাতটা বাড়ির দুটো বিক্রি করে দেব...'

নজিবুরের পিছন থেকে ইন্সপেক্টর মিনহাজ বললেন, 'নিয়াজ, হ্যান্ডকাফ নিয়ে এগোও তুমি...'

'মি. শহীদ খান, আমার আঁকা ছবিগুলো একবার দেখবেন না?' জিজ্ঞেস করল নজিবুর। সে দাঁড়িয়ে পড়েছে। 'আধুনিক শিল্প যারা বোঝে না তারা মনে করে আমি একটা পাগল। সত্যি কি তাই? আপনারও কি তাই ধারণা?' আবার ধীরে ধীরে সামনে বাড়ছে।

ঘরের চারদিকে দ্রুত একবার চোখ বুলাল শহীদ। ছবিগুলো অসুস্থ করে তুলল ওকে। শুধু তাই নয়, এক মুহূর্তের জন্যে অসতর্ক দেখাল ওকে। পরমুহূর্তে উপলব্ধি করল, নজিবুর ওর একেবারে কাছে পৌঁছে গেছে। 'নড়বে না!' হুঙ্কার ছাড়ল ও, হাতের রিভলবার নজিবুরের কপালে তাক করল।

'আমাকে আপনার ভয় পাবার কোন কারণ নেই,' হেসে উঠে বলল নজিবুর, চোখ দুটো চকচক করছে। 'দেখতেই তো পাচ্ছেন, আমি নিরস্ত্র।' তারপর, হাসিটা এখনও লেগে আছে ঠোঁটে, সোলায়মানের পেনডান্ট-এর রুবিতে চাপ দিল সে, সামনের দিকে

লাফ দিয়ে ছুরির ফলাটা শহীদের বুকে গাঁথার চেষ্টা করল। ছুরিটা লাগল শহীদকে, তবে সে-ও গুলি করেছে।

দু'দিন পরের ঘটনা। প্রাইভেট একটা ক্লিনিকের কেবিনে শুয়ে রয়েছে শহীদ। বেডের চার পাশে ভিড় করে বসে ও দাঁড়িয়ে রয়েছে মহুয়া, কামাল, মি. সিম্পসন, ইন্সপেক্টর মিনহাজ ও হায়দার আলি। ডাক্তাররা অনুমতি দেয়ায় আজই প্রথম ভিজিটররা শহীদের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেয়েছে।

শহীদের পাশে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে মহুয়া। সে কাঁদছে না, তবে চোখ দুটো সামান্য ভেজা ভেজা। মহুয়ার পাশ থেকে কামাল জিজ্ঞেস করল, 'এখন কেমন আছিস, শহীদ?'

'মারা যাব বলে মনে হচ্ছে না,' বলে একটা চোখ টিপল শহীদ। কথা বলায় ব্যথা পেয়েছে, মুখটা কুঁচকে উঠল। 'পাগলটা প্রায় মেরেই ফেলেছিল, বুঝলি! ডাক্তাররা বললেন, ছুরির ফলাটা আরেকটু ওপরে লাগলে হার্ট ফুটো হয়ে যেত।'

শহীদের বুকে কপাল ঠেকিয়ে ফুঁপিয়ে উঠল মহুয়া।

জোর করে হেসে উঠল শহীদ। 'আরে, করো কি! বেঁচে আছি, তাতেই যদি এত কাঁদো, মারা গেলে কি করবে!' স্ত্রীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিল ও। 'এই বোকা, তাকিয়ে দেখো, ওরা সবাই তোমার কাণ্ড দেখে হাসছেন!'

মুখ তুলে শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছল মহুয়া।

'পুরস্কারের টাকাটা মি. হায়দার পাচ্ছেন বটে,' মি. সিম্পসন পরিষ্কার বাংলায় বললেন, 'তবে কেসটা সলভ করার সমস্ত কৃতিত্ব একা তোমাকেই দিতে হয়। ভাল কথা, তুমি বোধহয় এখনও জানো না যে তোমার গুলি খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছে

নজিবুর।'

মাথা নাড়ল শহীদ। 'আপনার আসলে জানা নেই, মি. সিম্পসন,' বলল ও। 'কৃতিত্ব যদি কাউকে দিতে হয়, কুয়াশাকেই দিতে হবে। সেই বোতামটা অকুস্থলে খুঁজে পায়, পেয়ে আমার বাড়িতে দিয়ে আসে। টেলিপ্যাথীর সাহায্যে আরও একটা সূত্র পায় সে, সেটাও মহুয়াকে দিয়ে আসে। এই দুটো ক্লু ছাড়া নজিবুরকে সনাক্ত করা সম্ভব হত না।' একটু বিরতি নিয়ে একে একে সবার মুখের ওপর চোখ বুলাল ও। 'আমি আশা করেছিলাম আজ আমাকে কুয়াশা দেখতে আসবে। আসেনি, না?'

'পুলিসকে সে এড়িয়ে চলে, কাজেই আমরা যতক্ষণ থাকব ততক্ষণ সে আসবে না,' বললেন মি. সিম্পসন। 'হয়তো আমরা চলে যাবার অপেক্ষায় আশপাশেই কোথাও লুকিয়ে আছে।'

এই সময় সাদা ড্রেস পরা ও গলায় স্টেথস্কোপ ঝোলানো একজন ডাক্তার ঢুকলেন কেবিনে। 'মি. শহীদ এখন সম্পূর্ণ সুস্থ, তার বিপদ কেটে গেছে,' বললেন তিনি। তাঁর হাতে এক গোছা গোলাপ দেখা গেল। 'কিন্তু এখন ওনার পূর্ণ বিশ্রাম দরকার। আমার অনুরোধ, কেউই বেশিক্ষণ ওকে বিরক্ত করবেন না।'

সবাই নড়েচড়ে উঠল।

শহীদ ফুলগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে দেখে মুচকি হাসলেন ডাক্তার। 'এক ভদ্রলোক আপনাকে দেখতে এসেছিলেন, কিন্তু কেবিনে আর কাউকে ঢুকতে দেয়া যায় না, এ-কথা বলে বিদায় করে দিয়েছি। ভদ্রলোক হাসি মুখেই বিদায় নিলেন, যাবার সময় এই ফুলগুলো দিয়ে বললেন, আমি যেন এগুলো আপনার কাছে পৌঁছে দিই।'

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল মহুয়া। 'নিশ্চয়ই দাদা এসেছিলেন!' দরজার দিকে এগোল সে।

'আপনারা আর দু'মিনিটের মধ্যে কেবিন খালি করে দিন, মি. শহীদের বিশ্রাম দরকার,' বললেন ডাক্তার। 'মি. শহীদ, এখন আপনার কেমন লাগছে?'

হাসতে গিয়েও হাসল না শহীদ। বলল, 'ভালই আছি, ডাক্তার সাহেব। শুধু হাসতে গেলে ব্যথা পাই।'

'দু'একদিনের মধ্যে ঘা শুকিয়ে গেলে আর ব্যথা পাবেন না,' বলে ডাক্তারও মুহুয়ার পিছু নিয়ে কেবিন ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

সবাই অপেক্ষা করছে, মহুয়া ফিরে এলে বিদায় নিয়ে চলে যাবেন। প্রায় পাঁচ মিনিট পর ফিরল সে।

'কুয়াশা চলে গেছে?' তাকে জিজ্ঞেস করল শহীদ।

'স্বামীর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল মহুয়া। 'দাদাকে তুমি চিনতে পারোনি?'

শহীদ বলল, 'আমার চোখকে ফাঁকি দেয়া এত সহজ নয়, মহুয়া!'

মি. সিম্পসন ও কামাল একযোগে জানতে চাইল, 'কি ব্যাপার?'

হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠল মহুয়া।

ওদের প্রশ্নের জবাব দিল শহীদ। 'মি. সিম্পসন, কুয়াশা আবার আপনার চোখে ধুলো দিয়েছে।'

লাল চেহারা আরও লাল হয়ে উঠল, মি. সিম্পসন গম্ভীর সুরে জানতে চাইলেন, 'মানে?'

'ফুল নিয়ে আমাকে দেখে গেল কুয়াশা, অথচ আপনারা কেউ

তাকে চিনতেই পারলেন না,' বলল শহীদ।

'ওই ডাক্তার, মানে উনি এই ক্লিনিকের ডাক্তার ছিলেন না?'

মাথা নাড়ল শহীদ। 'না। ডাক্তারের ছদ্মবেশ নিয়ে কুয়াশাই এসেছিল।'

'ওহ্, গড!' বলে দ্রুত কেবিন ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন মি. সিম্পসন। সেদিকে তাকিয়ে মুচকি একটু হাসল শহীদ।

***

কুয়াশা-৭৭

কিলার

শেখ আবদুল হাকিম

এক ম্যানিয়াক ঢাকা শহরে একের পর এক খুন করে যাচ্ছে। প্রথম সূত্র তামার একটা বোতাম। দ্বিতীয় সূত্র একটা ধাঁধা– রক্তলাল চাঁদ, কালো আকাশ আর কমলা সৈকত। এই দুই সূত্র ধরে প্রাইভেট ডিটেকটিভ শহীদ খানকে খুঁজে বের করতে হবে বদ্ধ উন্মাদ এক সিরিয়াল কিলারকে। সাবধান! যতদিন না সে ধরা পড়ে, কল্যাণপুর বস্তির ওদিকটায় কারও না যাওয়াই ভাল।।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০